গানের ভিতর দিয়ে দেখি ভুবন খানি

- স্বামী দিব্যনাথানন্দ

সঙ্গীত আমাদের মনের ভাব প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। ভক্তিমার্গের অনেক সাধক সঙ্গীতকে ভগবানের প্রতি ভাব প্রকাশের অন্যতম পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মীরাবাঈ, নানক, সুরদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি উচ্চমার্গের সাধক-সাধিকা গানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের অন্তরের আর্তি ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের গান, বিশেষ করে পূজা পর্যায়ের গানও বাংলা সাহিত্য তথা বাংলাদেশের ভক্তির ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। সে সব গান ভাষার গভীরতায় ও সুরের মাধুর্যের গুণে আমাদের মনকে সহজে ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলে। আমরা অনুমান করতে পারি, কত সাধক এ সব গানের মধ্যে প্রার্থনার ভাষা খুঁজে পেয়েছেন। তাই, ঠিক যেমন শ্রবনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপায় হিসাবে সঙ্গীতকে ব্যবহার করা যেতে পারে, তেমনি, ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত আমাদের মনকে উচ্চ ভাবে রাঙ্গিয়ে জন্ম মরণের বন্ধন শিথিল করতে সাহায্য করে। কবিগুরুর ভাষায়

গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে ॥
বিশ্বকবির চিত্তমাঝে ভুবনবীণা যেথায় বাজে
জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে ॥
ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে,
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলে না তানে।
সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা-- সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা--
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে ॥

আমাদের এই জীবনের চলার পথে নানা মানুষ নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে এগিয়ে যান। সুখ-দুঃখ যদিও কম বেশি সকলের জীবনেই আসে, তবু কারোর জীবনে দুঃখকষ্ট যেন জন্ম থেকেই ছায়ার মত নিত্যসঙ্গী। কারোর শারীরিক অক্ষমতা, কেউ দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, কেউ বা পাপ-বোধে জর্জরিত। আবার সুখের অভাব না থাকলেও মানসিক অশান্তি ও অতৃপ্তি পেয়ে বসে অনেককে। অধিকাংশ মানুষই এর বাইরে কোনও আশার আলো দেখতে পান না, তাই জীবনের একমাত্র সম্বল হয়, দীর্ঘ নিঃশ্বাস। কিন্তু কোন কোন ভাগ্যবান, অনাথশরণ ভগবানকে ডাকেন আকুল হয়ে, যিনি ভক্তকে এই সুখ-দুঃখ পূর্ণ সংসারের পারে নিয়ে যেতে পারেন।

তারো তারো, হরি, দীনজনে।
ডাকো তোমার পথে, করুণাময়, পূজনসাধনহীন জনে॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ–
মরণমাঝারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণজনে॥

আমাদের চার পাশের যে সব জিনিষ কে অবলম্বন করে সাধারনতঃ আমরা চলি, যেমন আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজেদের সংসার, টাকাপয়সা, সমাজ, ইত্যাদি, যদিও সেসব আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, তবু অনেকের জীবনেই পরিণত বয়সে একটি অতৃপ্তি যেন পেয়ে বসে। এসবে তারা পরিপূর্ণ আনন্দ পান না। তখন তারা নিজ অন্তরে খোঁজেন তৃপ্তি। শাস্ত্র ও মহাপুরুষেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সুখে মানুষ যখন আর তৃপ্তি পায় না, যখন মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত কিছুর অন্বেষন করে, ধর্ম জীবন তখন শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই সত্যটি তাদের কাছে উন্মোচিত হয়, যে তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ, এই ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য সংসারে নিত্য বস্তু একমাত্র তিনি। তাঁর চেয়ে প্রিয়, আপনার আর কেউ নেই। সুখ-শান্তি-সম্পদ-ঐশ্বর্য ও তিনি। এই অনুভব হলে তিনি ভগবানের দিকে তাকিয়ে বলতে পারেনঃ

প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ॥
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে॥

আমাদের শাস্ত্র বলেন, আমরা প্রত্যেকেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। অনন্ত জ্ঞান, অসীম আনন্দের খনি রয়েছে আমাদের অন্তরে। তাহলে বাইরের জগতে আমরা আনন্দ খুঁজি কেন? কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এমন ভাবে তৈরি, যে তারা বাইরের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়ের দিকে ক্রমাগত ছুটছে। কোন কোন ভাগ্যবান, অমৃতত্ব লাভ করার জন্য মনকে অন্তর্মুখী করার জন্য সচেষ্ট হন। আমাদের অন্তরের ভেতর থেকে তিনি আমাদের ডাকছেন, কিন্তু তা বুঝতে না পেরে আমরা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি, বাইরের আপাত মনোহর সুখের অন্বেষণে। কিন্তু তৃপ্তি পাই কি? কিসের দিকে ছুটে চলি, বুঝতে পারি না।

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না॥
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না॥

ভগবান আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তিনি আমাদের সবচেয়ে ভালবাসার ধন। কিন্তু আমাদের মন স্বভাবতঃ বহির্মুখ বলে তাঁর দিকে আকর্ষণ হয় না। আমাদের এই দেহ-মন-চিত্ত-অহঙ্কার কে ঘিরে যে ছোট 'আমি' সেই 'আমি' কে ঘিরে কত আকাঙ্খা, কত চাহিদা। আমরা দেহ ও মনের নানা সুখ চাই, মান চাই, ভালবাসা চাই, তাই কখনও অন্তরের গভীরে সেই অসীমের আহ্বান এলেও, এই ছোট 'আমি'কে ছেড়ে, তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারি না। আমরা অনেকেই ভগবান বিশ্বাস করি, মন্দিরে-তীর্থে যাই, পুজার্চনা করি, কিন্তু নিজের সুখ-দুঃখের এই জগত ছেড়ে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারি না।

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।

আমাদের দৈন্য, অক্ষমতা, দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই করে আমরা যখন ম্রিয়মান হয়ে পড়ি, তখন আমাদের ভিতর জেগে ওঠে প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা। সেজন্য যুগ যুগ ধরে সাধকেরা প্রার্থনা করে আসছেন - অসতো মা সাদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা আমৃতম্ গময়। রবীন্দ্রনাথের গানেও আমরা একই ভাব পাই।

ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে ।।
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ।।
আমার ইচ্ছা হইতে, প্রভু, তোমার ইচ্ছামাঝে-
আমার স্বার্থ হইতে, প্রভু, তব মঙ্গলকাজে-
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে-
আমা হতে, নাথ, তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ।।

সাধক যত সাধনার উচ্চ শিখরে আরোহন করে চলেন, তাঁর আরাধিত ভগবানের সঙ্গে ভাব যত গাঢ় হতে থাকে, তত নিজেকে আরও বেশী সমর্পণ করতে চান তাঁর চরণে। তখন দুঃখের নিবৃত্তির জন্য বা কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান না, তাঁরই ইচ্ছায় নিজের ক্ষুদ্র জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চান। সাধকের দৃঢ় ধারনা হতে থাকে, যিনি মঙ্গলময়, তাঁর দ্বারা কখনও অমঙ্গল হতে পারে না। তখন তাঁর ঈশ্বর আরাধনায় আত্মসমর্পণের ভাব জাগে

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা--
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে--
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।।

সাধকদের জীবনে ভগবানের যখন কৃপা আসে, তখন তাঁদের নিজ সত্তার বিলুপ্তি ঘটে, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘটনায় ভগবানের ইচ্ছা অনুভব করেন, তখন তাঁর অনুভুতিতে ধরা পড়ে, তিনি যাঁকে কৃপা করেন, তাঁর কাছ থেকে সুখ কেড়ে নেন তাকে অনন্ত সুখী করতে চান বলে। অনেক সময় আত্মীয় স্বজনকে কেড়ে নেন, তিনিই যে পরমাত্মীয়, তা বোধ করাবার জন্য। তাঁর ভক্তের জীবনকে তিনি ভেঙ্গে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলেন। সাধক তখন আনন্দের সঙ্গে বলতে পারেনঃ

সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে–
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে–
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছ তোমারি দুয়ারে॥

ওঁ তত্ সৎ

অপরাজেয় বাঙ্গালী বিদ্যাসাগর - দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীর আলোকে

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা এবং পটভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালীন বঙ্গীয় এবং ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের জীবন এবং কাজকর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মানব ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির যেমন উত্থান ঘটেছে, তেমনি তাদের অনেকের অবক্ষয় বা পতনও হয়েছে। আবার তাদের কারো কারো পুনরুত্থানও ঘটেছে। যে ভূখণ্ড এখন ভারতীয় উপমহাদেশ নামে পরিচিত, সেখানে যে সভ্যতা বিকশিত হয়েছে সেটিও এই উত্থান-পতনের চক্রে আবর্তিত হয়েছে। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণ এবং অনুপ্রবেশে সেই সভ্যতার অবক্ষয় এবং পরিবর্তন ঘটেছে এবং তা বাধ্য হয়েছে বিদেশী শক্তির বশীভূত হতে এবং বিদেশী সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হতে। পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন অভিবাসীদের আগমন এখানকার অধিবাসীদের জীবনধারাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েক শ' বছর বাংলা (তখনকার নাম গৌড়) সহ উত্তর ভারত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই রাজ্যগুলি প্রায়শই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। সেজন্য তারা সম্মিলিতভাবে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার আক্রমণকারীরা উত্তর-পশ্চিম ভারত দখল করে। তারপর দখল করে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতার কেন্দ্র দিল্লী। এর পর পাঁচশো বছর ধরে বিদেশী শাসককুল ভারতের উত্তর অঞ্চল শাসন করে। এই শাসকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারা সকলেই ছিল মুসলমান। এদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হ'ল মুঘলরা। তারা দুশো বছরেরও বেশী সময় ধরে শাসনক্ষমতায় ছিল। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ভারতের জনগণের বৃহদংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। প্রবল পরাক্রমশালী বিদেশী শাসকদের প্রতিহত করতে না পেরে তারা বাধ্য হয় নিজভূমে প্রায়-পরবাসী হয়ে জীবনযাপন করতে। তাদের সভ্যতা চলচ্ছক্তিহীন, অবক্ষয়ী সভ্যতায় পরিণত হয়।

বৃটিশের ভারত দখল – রাজনৈতিক প্রভুত্ব এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

ইতিমধ্যে ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। রেনেসাঁ-সমৃদ্ধ ইউরোপীয় জাতিগুলি মানব-প্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করছে। যান্ত্রিক এবং সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা দূরবর্তী ভূখণ্ডে ভ্রমণ এবং সেগুলি দখল করে নেবার ক্ষমতা অর্জন করছে। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশরা ভারত দখল শুরু করে এবং এই দখলদারি সম্পূর্ণ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। শাসক হিসেবে এই নতুন বিদেশী শাসকেরা তাদের পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক ছিল না। শাসিতের কল্যাণ নয়, শক্তি এবং প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার এবং সমৃদ্ধি সাধনই ছিল তাদের মুল লক্ষ্য। তবে পূর্বসূরীদের থেকে এক জায়গায় তাদের লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। নবজাগরণে আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপ থেকে তারা এনেছিল যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা এবং অনুসন্ধিৎসা যা ছিল তৎকালীন রুদ্ধ এবং পশ্চাদ্মুখী ভারতীয় সমাজে নিতান্তই অনুপস্থিত।

রাজা রামমোহন রায় এবং বাংলার নবজাগরণের শুরু

ভারতে কোন ইউরোপীয় শক্তির সাথে প্রথম উল্লেখযোগ্য আদান-প্রদান হয় বাংলার মাটিতে, যেখানে বৃটিশ শাসনের পত্তন হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে এই আদান-প্রদান মানবেতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে একটি স্থবির, অবক্ষয়ী প্রাচীন সভ্যতা নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করতে শুরু করল। প্রাচীন সভ্যতাটি নতুনকে বরণ করে নিয়ে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পুনরায় সামনের দিকে যাত্রা শুরু করল। ইউরোপের নতুন চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা বিদগ্ধ বাঙ্গালীদের আকৃষ্ট করল এবং তাঁদের মাধ্যমেই 'ভারতের নবজাগরণ'এরও সূত্রপাত হ'ল। এই নবজাগরণের জনক বলা হয় রাজা রামমোহন রায়কে, যিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ এবং ভূ-পর্যটক। তৎকালীন অনেক গর্হিত এবং নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা (যথা সতীদাহ) বিলোপ করার জন্য তিনি অনলস চেষ্টা করে গেছেন এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছেন।

রামমোহন রায়ের প্রভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর ধ্যান-ধারণা এবং কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হলেন। পরবর্তী একশো বছরে প্রথমে তাঁর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ অনেক বিদগ্ধ বাঙালী এবং পরবর্তীকালে অনেক বিদগ্ধ ভারতীয়ের আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, ভাষা, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অবদান সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে এবং এর ফলে ভারতীয় জীবনে পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ সূচিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর – অসাধারণ পণ্ডিত এবং সমাজ-সংস্কারক

এবার আসা যাক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথায়, যাঁর জীবনাদর্শে এবং বিপুল অবদানে বাংলা তথা সমগ্র ভারত আলোকিত ও উপকৃত হয়েছে। আমি আশা করি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যারা তাদের পূর্বপুরুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের চেয়ে ভিন্নতর পরিবেশে বড় হচ্ছে, তাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাবে। হয়তো তাদের কেউ কেউ আরো পড়াশোনা, আরো অনুসন্ধান করে এই প্রাচীন ভূখণ্ডের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস এবং বিশ্বসভ্যতায় তাঁদের অবদানের প্রেক্ষিতে নিজেদের বহুবিধ সংস্কৃতিবোধকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। নবজাগরণের এই অন্যতম পথিকৃতের অবদানকে সম্যক উপলব্ধি করতে প্রবন্ধের পটভূমিকায় বিবৃত বিগত কমবেশী হাজার বছরের ভারত-ইতিহাসকে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনকাল ১৮২০ – ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ। 'বিদ্যাসাগর' হল তাঁর সাম্মানিক উপাধি যার অর্থ হ'ল বিদ্যার সাগর, বা পরম বিদ্বান। শিক্ষাদীক্ষায় তিনি প্রকৃতই ছিলেন বিদ্যার সাগর। একাধারে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, বাংলা গদ্য রচনার পথিকৃত, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী এবং দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের সহমর্মী। দয়া এবং মমত্ববোধের জন্য তাঁর আর একটি উপাধি হ'ল 'করুণাসিন্ধু', যার অর্থ 'দয়ার সাগর'। পার্থিব ধনদৌলত বা বংশগত আভিজাত্য বলতে তাঁর তেমন কিছু ছিল না, তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষেরই একজন। যে বাধা এবং প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা অনেক সংগ্রামীর পক্ষেও সম্ভব হয় না, বিদ্যাসাগর সেগুলি অতিক্রম করে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। তাঁর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বাঙ্গালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছেন - "অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারংবার"।

বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পরিচয়, বাল্যকাল, শিক্ষা এবং কর্মজীবন

'ঈশ্বর' (তাঁর বাবা-মা তাঁকে এই নামেই ডাকতেন)-এর জন্ম তৎকালীন বাংলার হুগলী জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর বাবা-মা দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক

সামাজিক এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। সেই সময় অনেকেই কিন্তু তা ছিলেন না। ঈশ্বরের জীবনে মা ভগবতীদেবীর প্রভাব ছিল অপরিসীম। এক সহজ সরল গ্রাম্য মহিলা ছিলেন তিনি। স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না, কিন্তু হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং মহাকাব্যগুলি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যে বালক ঈশ্বরের আগ্রহ ও অনুরাগ এবং দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি মমত্ব ও কর্তব্যবোধ অনেকাংশে তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া।

ভগবতীদেবীর বৈষয়িক সঙ্গতি বিশেষ ছিল না, কিন্তু তাঁর হৃদয়টি ছিল বিশাল। যাদের নেই বা কম আছে, তাদের সাথে নিজের সীমিত সম্পদই ভাগ করে নিতেন। ঈশ্বর মায়ের এই গুণগুলি খুবই পছন্দ করতেন এবং নিজেও সেগুলি আয়ত্ব করেন। স্বর্ণালঙ্কার মহিলাদের খুবই প্রিয়, কিন্তু তাঁর দরিদ্র মায়ের কোন অলঙ্কার ছিল না। কথিত আছে, ঈশ্বর যখন প্রতিষ্ঠিত নব্যযুবক, তখন তিনি মাকে কিছু স্বর্ণালঙ্কার কিনে দিতে চেয়েছিলেন। মায়ের সগর্ব উত্তর ছিল ঈশ্বরের মত হৃদয়বান, দরিদ্র-দরদী পুত্রই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার! আর এক বার গ্রামের কোন একটি ধর্মীয় উৎসবে বিদ্যাসাগরের কাছে উপরোধ আসে একটি বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্যের। উত্তরে মায়ের কাছে ঈশ্বর প্রস্তাব করলেন উৎসবের পরিবর্তে দরিদ্রনারায়ণের সেবাতেই বরং অর্থের সদ্ব্যবহার করা যাক। মায়ের দ্বিধাহীন উত্তর ছিল যদি বিভিন্ন উৎসবের জন্য সংগৃহীত অর্থে সারাবছর দরিদ্রদের সাহায্য করা যায়, তবে পূজা করার, উৎসব পালনের কোন প্রয়োজন হবে না।

পুত্রহিসেবে বিদ্যাসাগর ছিলেন পিতামাতার প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল এবং তিনি ছিলেন নির্ভীক স্পষ্টবক্তা। একবার বিদ্যাসাগর যখন তাঁর পিতামাতার সঙ্গে কাশীতে রয়েছেন, একদল কাশীবাসী ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে আসেন। তাঁরা নিশ্চয়ই দাতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা জানতেন এবং হয়ত আশা করেছিলেন পুণ্যভূমি কাশীতে তিনি আরও মুক্তহস্ত হবেন। কিন্তু তাঁদের অবস্থা ও স্বভাব লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর তাঁদের দয়া বা ভক্তির পাত্র বলে মনে করলেন না এবং তাঁদের স্পষ্ট বলে দিলেন - "এখানে আছেন বলিয়া আপনাদের যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তা হ'লে আমার মত নরাধম আর নাই।" এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণকুল তাচ্ছিল্যের স্বরে তাঁকে ইঙ্গিত করলেন যে তিনি তা হলে হয়ত কিছুই মানেন না। পিতা-মাতার দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন যে পিতা-মাতাই তাঁর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা।

আবার বিদ্যাসাগরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই পিতাই যখন বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণকে শিক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠাতে অনুমতি দিলেন না, বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়ে পিতাকে বললেন – "আপনি নিজেকে নিরামিষাশী বলেন অথচ স্নেহবশে আমার পুত্রের মস্তকটি চর্বণ করিতেছেন!"

ঈশ্বরের শৈশবকালে বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় কর্মরত ছিলেন। তখন কলকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী। ঠাকুরদাস উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি পুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ন'বছর বয়সের ঈশ্বরকে কলকাতায় এনে ভাল স্কুলে তার পড়ার ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত কলেজে তখন সংস্কৃত এবং ইংরাজী দুটোই শেখানো হত। ঈশ্বর সেখানে ইংরাজী শিখলেন। তার সাথে শিখলেন সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য ছাড়াও ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র এবং দর্শন। দশ বছর ধরে সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় তিনি অনেকগুলি বৃত্তিও পেয়েছিলেন, যেগুলি আর্থিক দিক থেকে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সহায়ক হয়েছিল। কর্মজগতে তাঁর প্রথম প্রবেশ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত বা সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে। কয়েক বছর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন প্রথমে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে। ক্রমশ তিনি এই কলেজটির অধ্যক্ষের পদ পান এবং সঙ্গে সরকারের শিক্ষা বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, বাংলার কয়েকটি জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস, হিসেবেও তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর আগে এই পদে কোন ভারতীয় নিযুক্ত হন নি। এই পদের সুবাদে তিনি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষাবিস্তারের, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় সাফল্য

বিদ্যাসাগরের সৃজনশীল এবং ব্যস্ত কর্মজীবনের কথা বিশদভাবে লিখতে গেলে কয়েকশো পাতার একটা বই হয়ে যাবে। আমি তাই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সাফল্য নিয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তাঁর এই সাফল্যগুলির জন্য প্রত্যেক বাঙালী এবং বাংলার বাইরের ভারতীয়রাও উপকৃত হয়েছে। এই সাফল্যের ক্ষেত্রগুলি হ'ল – (১) বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য, (২) সমাজ-সংস্কার, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা এবং (৩) স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার – বিশেষতঃ গ্রাম বাংলায়।

(১) বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য – ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার এক অসাধারণ বিকাশ ও উন্নতি হয়। এরই প্রভাবে উনিশ ও বিশ শতকের অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যেরও উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটে এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সাহিত্যসৃষ্টি জগৎজোড়া খ্যাতি ও সমাদর লাভ করে। বিদ্যাসাগর-কৃত বাংলা ভাষার সংস্কার ছিল এই বিস্ময়কর উন্নতির প্রধান সোপান। বাংলাভাষার খ্যাতিমান সাহিত্যস্রষ্টারা প্রত্যেকেই এজন্য বিদ্যাসাগরের কাছে গভীরভাবে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বিবর্তন ও উন্নতিতে বিদ্যাসাগরের অসাধারণ অবদান বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিচারে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণ।

বিদ্যাসাগরের আমলেও বাংলা লেখার একটা ভঙ্গী বা স্টাইল ছিল। কিন্তু তা ছিল সংস্কৃতের উপর নির্ভরশীল বা সংস্কৃত- ঘেঁসা, কথ্য বাংলার সাথে তার মিল ছিল সীমিত। লিখিত বাংলা সংস্কৃতকেই অনুসরণ করত এবং তার ফলে সেই ভাষায় স্বচ্ছন্দ প্রবাহের অভাব ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলতার আবর্তে বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি ছিল শ্লথ। বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি ব্যাকরণের জটিল নিয়ম-কানুনকে সরল করে বাংলা ভাষাকে আরও বিকশিত করে তোলেন। ধ্রুপদী সংস্কৃত ব্যাকরণকে সরলতর করে বাংলা ভাষায় তিনি দুটি বই প্রকাশ করেন যাতে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয় এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্য সহজে বোঝা যায়। এই যুগান্তকারী বইদুটির নাম "ব্যাকরণ-কৌমুদী" ও "সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা", যা আজও সংস্কৃত-অনুরাগী বাঙ্গালী পাঠকের নিত্যসঙ্গী।

বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ণপরিচয় প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ নামে বাংলা অক্ষর পরিচয়ের এবং ব্যবহারবিধির দুটি সুসংহত ভিত্তিপুস্তক প্রকাশ করেন। নতুন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন এবং দক্ষতা মাথায় রেখে ধাপে ধাপে তাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য এ দুটি ছিল প্রথম সোপান এবং বিদ্যাসাগরের অসামান্য সাফল্যের সার্থক ফসল। ব্যাকরণের সহজ-সরল নিয়ম প্রয়োগ করে এগুলি সরল বাংলা গদ্য লিখতে শেখায় এবং তারপর সেই গদ্যের মাধ্যমে গল্প বলে নীতিশিক্ষা দেয়। এইভাবে সুকুমারমতি বালক বালিকাদের জন্য ভাষাশিক্ষার সাথে নীতিশিক্ষার লক্ষ্যটি পূরণের চেষ্টা হয়। বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগে সংস্কৃত ব্যাকরণের জটিলতা ছাড়াই সরল বাংলায় গদ্য লেখার প্রচলন হ'ল। পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ বাংলা গদ্যের যে বিকাশ হয়েছে তা বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগেরই ফল এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

এত বছর পরে আজকের দিনেও বেশীরভাগ বাঙালী ছাত্রছাত্রী তাদের প্রথাগত শিক্ষা শুরু করে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বিদ্যারম্ভের জন্য নতুন নতুন পুস্তক লিখিত হলেও তারা প্রত্যেকেই বিদ্যাসাগরের যুগান্তকারী সৃষ্টির ঋণ স্বীকার করে। এগুলি ছাড়া বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে এবং আঙ্গিকে বেশ কিছু বহুল প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ করেন। এর ফলে বৃহত্তর সমাজের কাছে এই বার্তা পৌঁছায় যে বাংলা ভাষা তার নিজস্ব শক্তিতেই ভাব প্রকাশ করতে এবং যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠতে সক্ষম। এ বাপারে অন্য ভাষাগুলির সাথে বাংলা ভাষার দক্ষতার কোন পার্থক্য নেই। বিদ্যাসাগর বাংলায় বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প লেখেন এবং তাঁর সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলির সপক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়ে ছোট ছোট প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। বাংলা, ইংরেজি এবং সংস্কৃতে স্বল্প দৈর্ঘ্যের লেখা ছাড়াও তিনি বাংলা, হিন্দী এবং সংস্কৃতে কমবেশী এক ডজন বই প্রকাশ বা সম্পাদনা করেন। এই ভাষা এবং সাহিত্য-সাফল্যগুলি তাঁর প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য এবং অধ্যবসায়ের পরিচায়ক।

শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের কিন্তু ব্যবসায়ী বুদ্ধিরও অভাব ছিল না। তিনি তাঁর নিজের রচিত বইগুলির মুদ্রণ এবং বিক্রয়ের দায়িত্ব অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে Sanskrit Press Depository নামে একটি পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাঁর বইগুলি সরাসরি এখান থেকেই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির বাজার এতই ভাল ছিল যে বিদ্যাসাগরের আয় এক সময় বেশ উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় যার ফলে তিনি তাঁর সংস্কার-মূলক কাজকর্মের যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করতে সক্ষম হন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর রচিত বর্ণপরিচয়ের বিক্রয়-সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন লাখেরও বেশী। তাঁর এই বিপুল আয় কিন্তু তাঁর নিজের সহজ-সরল জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন আনে নি। বরং অকাতরে দান এবং সংস্কারমূলক কাজে খরচ করতে গিয়ে তিনি প্রায়শই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন।

(২) সমাজ-সংস্কার – হিন্দু সমাজে প্রচলিত নারী নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের একক লড়াই – বিদ্যাসাগরের সাফল্য বহুমুখী, কিন্তু তিনি নিজে মনে করতেন সমাজ-সংস্কার, বিশেষতঃ হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু সমাজে মহিলাদের স্থান ছিল যুগপৎ সম্মানিতার এবং নিপীড়িতার। নিজেদের পরিবারের মধ্যে পারিবারিক খরচপত্র সামলানোর দায়িত্ব ছিল মহিলাদের। পরিবারের সদস্য/সদস্যাদের বিবাহ এবং বয়স্ক/বয়স্কাদের যত্ন, সেবা-শুশ্রুষার ব্যাপারেও তাঁদের মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হ'ত। হিন্দু সমাজে মহিলাদের সাথে সম্মানজনকভাবে আচার-ব্যবহারের রীতি তখনও ছিল, এখনও আছে। যেমন মহিলাদের 'মা' বা 'ভগিনী' বলে সম্বোধন করা। এসব সত্ত্বেও সমাজ মহিলাদের পুরুষের সমকক্ষ বলে মেনে নিত না। পুরুষদের তুলনায় তাঁদের সম্পত্তির অধিকার এবং শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। বিবাহিতা মহিলাদের পরিচয় ছিল স্বামীর পরিচয়ে, আর অবিবাহিতাদের পিতৃপরিচয়ে। এই সব সামাজিক বিধি-নিষেধের গন্ডির মধ্যে মহিলারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা সামাজিক মান্যতা প্রত্যাশা করতে পারতেন না। এছাড়া বালক-বালিকাদের বাল্যবিবাহ এবং কোন কোন বর্ণের পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহের মত কুপ্রথা এবং পরিস্থিতি-বিশেষে সদ্যোজাত কন্যাসন্তান হত্যার মত নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত প্রথাগুলি ছাড়াও সম্ভবত আরও অমানবিক এবং নিষ্ঠুর দুটি প্রথা চালু ছিল। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার ছিল না এবং তাঁদের অনেকেই স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে বাধ্য হয়ে কুখ্যাত সতীদাহ প্রথার শিকার হতেন।

বাংলার সমাজ সংস্কারের পুরোধা রামমোহন রায়ই নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং এটির অবলুপ্তির জন্য তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণর উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহায়তায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করাতে সমর্থ হ'ন। তাঁর প্রচেষ্টায় অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যেই বাংলার সমাজ থেকে চিরতরে সতীদাহ প্রথার বিলোপ ঘটে। এর পর বাকি থাকে মহিলাদের নিপীড়নের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সংস্কার। বিদ্যাসাগর সেই কাজে ব্রতী হলেন।

কথিত আছে একবার বিদ্যাসাগর গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে গেলে একটি পরিবারের বিবাদ মীমাংসার জন্য অনুরুদ্ধ হ'ন। ব্যাপারটা ছিল এই যে এগারো বছরের এক বালবিধবা প্রচণ্ড গরমে এক উপবাসের দিনে লুকিয়ে জলপান করেছিল। তৎকালীন সামাজিক বিধি অনুসারে নিরম্বু উপবাসের দিনে বিধবাদের জন্য সামান্য জলপানও নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর পরিবারটিকে এবং গ্রাম্য মাতব্বরদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে একটি বালিকার জন্য এরকম কঠোর নিয়ম শিথিল করাই সঙ্গত। কিন্তু গোঁড়া মাতব্বররা যুক্তি দেখান যে এই সামাজিক নিয়ম দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং এতে শাস্ত্রেরও সম্মতি আছে।

এই ঘটনার পর বিদ্যাসাগর অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও বিধবা মহিলাদের পুনর্বিবাহের বিধান আছে কিনা। যখন তিনি ঋষি পরাশরের 'পরাশর সংহিতা'য় হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেলেন, তখন তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন। সংহিতার বিধানটি এই রকম "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।" অর্থাৎ যে পাঁচটি পরিস্থিতিতে স্ত্রী পুনর্বিবাহ করতে পারবেন তা হল - স্বামী দুশ্চরিত্র হলে, মারা গেলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে গেলে, নপুংসক হলে অথবা জাতিচ্যুত (পতিত) হলে।

এই শাস্ত্রীয় বিধানকে বৃহত্তর সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম শুরু হল। তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করলেন যাতে পরাশর সংহিতার বিধানগুলির উল্লেখ ছিল। দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় এই প্রচারপত্র সম্পর্কে লেখা হয়েছিল যে প্রচারপত্রটি যুক্তিগ্রাহ্য, ব্যবসায়িক দক্ষতায়, পরিস্কার সহজবোধ্য ভাষায় লেখা হয়েছে এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটি সমাজে আলোড়ন তুলেছে। দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট আরও লিখেছিল যে প্রচারপত্রের বৈপ্লবিক বাণী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পৌঁছেছিল এবং বাঙালী সমাজকে তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

সমাজের অনেকেই তখন মনে করেছিলেন যে বিদ্যাসাগর যে পরিবর্তনগুলি করতে চাইছিলেন সেগুলি হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে এবং তা সামাজিকভাবে ক্ষতিকর হবে। তাঁরা বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। কদর্য ভাষায় এবং অনেক সময় বিদ্যাসাগরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হল। প্রচলিত রীতিকে সমর্থন না করে তার বিরোধিতা করার জন্য বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যকে ব্যঙ্গ করা হ'ল। এমনকি তাঁর প্রাণনাশের এবং সম্পত্তিহানির ভীতি প্রদর্শন করা হতে থাকল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন লৌহকঠিন মানসিকতার মানুষ। তাঁর এক বড়ভাইও তাঁকে এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে স্পষ্ট বলেছিলেন, "আমি যখন আমার উদ্দেশ্যের যথার্থতা বুঝতে পারি, তখন কোন কিছুই আমাকে সে উদ্দেশ্য সাধনের সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করতে পারে না। যে সামাজিক অনাচার বিধবাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে তা চিরতরে দূর করতে প্রয়োজনে আমি সব কিছু, এমনকি আমার জীবনও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ২০১১ সাল থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 'আন্তর্জাতিক বিধবা দিবস' চালু করেছে। এটি প্রতিবছর ২৩শে জুন পালিত হয়। এটি যেন সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে এক বাঙ্গালী সমাজসংস্কারকের যুগান্তকারী সুকীর্তিরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বিদ্যাসাগর অসম্ভবকে সম্ভব করলেন -

বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইনসভায় পেশ করা হ'ল। প্রাথমিক বিবেচনার পর আইনসভা সেটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাল। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ৩৩,০০০ স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দরখাস্ত কমিটিতে পেশ হ'ল। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক দরখাস্ত - কোনটি প্রস্তাবকে সমর্থন করে, আবার কোনটি এর বিরোধিতা করে - সিলেক্ট কমিটিতে পৌঁছাল। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রস্তাবের সপেক্ষে আরও জোরালো যুক্তি দিয়ে আর একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করলেন। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর আইনসভা অবশেষে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের সকল বাধা দূর করে ১৮৫৬ সালের পঞ্চদশ আইনটি পাশ করল। বিদ্যাসাগর তাঁর নিষ্ঠুর এবং সংকীর্ণমনা বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিপুলভাবে জয়লাভ করলেন। তবে তিনি এই নতুন আইন নিয়ে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। নির্যাতিতা বিধবাদের মুক্তির একটা উপায় খুঁজে পাওয়াতেই তিনি খুশী হয়েছিলেন। এমনই আত্মপ্রচার-বিমুখ মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর।

শুধু আইন পাশ করিয়েই কিন্তু বিদ্যাসাগর থেমে যান নি। ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৬৭'র মধ্যে নিজ উৎসাহে এবং প্রচেষ্টায় এবং প্রায়শ নিজের খরচে তিনি প্রায় ৬০টি বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক ব্রাহ্ম যুবক এই কাজে তাঁর সহায়ক হয়েছিলেন, কিন্তু গোঁড়া হিন্দু সমাজের অনেকে তাঁর শুধু বিরোধিতাই করেন নি, তাঁর শারীরিক বা বৈষয়িক ক্ষতি করার, এমন কি প্রাণনাশেরও ভয় দেখিয়েছিলেন। এই ধরণের বিরোধিতা এবং ভীতি-প্রদর্শন বিদ্যাসাগরের উদ্যোগকে অবশ্যই স্তিমিত করতে পারে নি। কিন্তু কিছু কিছু অবস্থাপন্ন মানুষ যাঁরা তাঁকে সংস্কারমূলক কাজকর্মে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা তাঁর সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। ফলে সমস্ত খরচের ভার বিদ্যাসাগরকে বহন করতে হয়। বিদ্যাসাগর কিন্তু ঋণগ্রস্ত হয়েও তাঁর উদ্যোগ থেকে সরে আসেন নি।

এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের নিন্দা শুধু সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁর বিরূপ সমালোচকদের অন্যতম ছিলেন।

আবার, অন্যদিকে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বহুমুখী বিশিষ্টতার প্রশংসাও যে আসে নি তা নয়। প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক এবং কাছের মানুষ। মধু-কবির ভাষায় বিদ্যাসাগরের ছিল "wisdom of an ancient Indian sage, energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother."

লিপিবদ্ধ নথি থেকে জানা যায় যে কলকাতায় প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের উপস্থিতিতে ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর। পাত্রীর বয়স ছিল এগারো বছর। আর পাত্র সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত আঠারো বছরের নবযুবক। এর পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বিধবা-বিবাহের সংবাদ আসতে শুরু করল, যাতে বোঝা গেল ব্যবস্থাটি ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। কিছু সমালোচক প্রচার করলেন যে বিদ্যাসাগরের সাফল্য নিতান্তই 'পরস্মৈপদী', অর্থাৎ অনাত্মীয়ের মধ্যে বিধবা বিবাহে তাঁর সম্মতি থাকলেও তিনি নিজের কোন আত্মীয়ের এভাবে বিবাহ নিশ্চয়ই দেবেন না। শীঘ্রই সেই পরীক্ষাও উপস্থিত হল, যখন তাঁর পুত্র এক বিধবাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করল। এই বিবাহ সংঘটিত হ'লে বিদ্যাসাগর এবং তাঁর পরিবারকে পরিত্যাগ করবেন বলে কিছু আত্মীয় হুমকি দিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন যে কোনকিছুই পুত্রের বিবাহস্থলে তাঁর উপস্থিতি আটকাতে পারবে না। বস্তুত, তাঁর পুত্র স্বেচ্ছায় বিধবা-বিবাহ করছে – এতে বিদ্যাসাগরের মনোবল বেড়ে গেল

এবং তাঁর অবস্থান আরও দৃঢ় হ'ল। উৎফুল্ল বিদ্যাসাগর এবং আরও অনেকের উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণ বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করলেন। অবশ্য এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের পিতা-মাতা এবং স্ত্রী যোগদান করেন নি।

(৩) স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার – বিদ্যাসাগরের আর একটি প্রচেষ্টা - বিধবা-বিবাহ প্রচলনের মত আর একটি সমান দুরূহ কাজে বিদ্যাসাগর তাঁর উদ্যম এবং পরিশ্রম নিয়োগ করেছিলেন। তা হ'ল বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার। জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন নামে কেম্ব্রিজে শিক্ষিত এক ইংরেজ সাহেব ১৮৪৮ সালে কলকাতায় আসেন এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারী হিসাবে। বেথুনসাহেব খাঁটি-বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হলেন। অবশ্য তার আগেই তিনি বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের কথা শুনেছিলেন। বিদ্যাসাগর বেথুনসাহেবকে জানালেন যে গোঁড়া হিন্দুদের (মিথ্যা) বিশ্বাস যে স্ত্রী-শিক্ষা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর এবং সেজন্য স্ত্রী-শিক্ষায় শাস্ত্রের সমর্থন নেই, যদিও 'স্ত্রী-শিক্ষায় ধর্মশাস্ত্রের সমর্থন নেই' এই মত তিনি নিজে পোষণ করেন না। সুতরাং সংশয়ী বিদ্যাসাগর আবার শাস্ত্রানুসন্ধান শুরু করলেন হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতিতে তাঁর নিজের বিশ্বাসের সমর্থনে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। একটি প্রাচীন পুঁথিতে দেখলেন যে সেখানে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে 'পুত্রের মত কন্যাকেও একইভাবে লালন-পালন করবে এবং তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করবে।'

সরকারী অনুদানে এবং বাংলার কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যে নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮-র মধ্যে বাংলার চারটি জেলার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর এমন উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারটি চালনা করছিলেন যে জনগণের কাছে সরকারের সহায়তার ভূমিকাটি তেমনভাবে পরিস্ফুট হচ্ছিল না। এতে করে ব্রিটিশ অফিসাররা অখুশী ছিলেন। তাঁরা এই মর্মে হুকুম জারী করলেন যে বিদ্যাসাগর যেন নতুন কর্মসূচী নেবার আগে সরকারের অনুমতি নেন। তাছাড়া সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশায় যে স্কুলগুলি তিনি ইতিমধ্যে চালু করেছিলেন সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানও দেওয়া হল না। এর ফলে শিক্ষকদের প্রাপ্য বেতনও বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরই এই শিক্ষদের নিয়োগ করেছিলেন। সুতরাং নীতিগতভাবে বেতন দেবার দায়টি বিদ্যাসাগরের উপরই বর্ত্তাল। প্রয়োজনীয় টাকার অঙ্কটা ছিল তিন হাজার। তখনকার দিনে এটা একটা বিরাট অঙ্কের টাকা। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের সামর্থ্য থেকে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেন। কিন্তু নতুন স্কুল খোলা তাঁকে বন্ধ করতে হ'ল।

এতে তিনি অপমানিত বোধ করলেন এবং হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। ঠিক করলেন যে সরকারী বেতনভোগী তিনি আর থাকবেন না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মত মর্য্যাদাসম্পন্ন উচ্চপদ সমেত অন্যান্য যাবতীয় সরকারী পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিলেন। তাঁর সরকারী বেতনের বাইরের আর্থিক স্বাচ্ছন্দের কথা আগে বলা হয়েছে, তাই উচ্চ বেতনের মোহ তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। এটা ছিল ১৮৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। যাই হোক, একবছর পরে সরকার পিছু হটে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির আর্থিক অনুদান পুনরায় চালু করল। এর মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা যা এতদিন অস্বীকৃত ছিল তা সরকারী স্বীকৃতি পেল। স্ত্রী-শিক্ষার কার্যক্রম চলতে থাকল। সারা বাংলাতেই বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যা আজকের দিনেও শিক্ষাবিস্তারে, বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে, বিদ্যাসাগরের অবদানের সাক্ষ্য বহন করে।

এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন শুধু নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। সাধারণ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হতে সময় এবং শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাই বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করে বা স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে গ্রামে-গঞ্জে স্কুল খুলে বিদ্যাসাগর যে তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার ফল সুদূরপ্রসারী কতটা হয়েছিল তা নিয়ে তর্কের অবকাশ এখনও আছে। যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে হিন্দুসমাজে স্ত্রী- পুরুষ বৈষম্য আজও বর্তমান।

শহরে বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগরের সাঁওতাল পল্লীতে স্বেচ্ছানির্বাসন

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। বহু বছর ধরে নিজের শরীরের এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর না দিয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। কলকাতার মত বড় এবং ব্যস্ত শহরে তাঁর স্বাস্থ্যের উপর ব্যস্ত জীবনের হানিকর প্রভাব পড়েছে। বিদ্যাসাগর প্রায় চুপিসাড়ে কলকাতা ত্যাগ করে সাঁওতাল পরগণার কারমাটাড় নামে এক ছোট পল্লীতে বাড়ি করে স্বেচ্ছানির্বাসনের জীবন শুরু করেন। কারমাটাড় বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার সাঁওতাল অধিবাসীরা বিদ্যাসাগরকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করল। তাদের কাছে তিনি ছিলেন 'নরদেহে ঈশ্বর' এবং তারা তাঁকে 'ঈশ্বর' (ভগবান) বলেই ডাকত। বিদ্যাসাগরের নাম 'ঈশ্বর' কথাটির অর্থও হ'ল ভগবান। বিদ্যাসাগর এই পরিশ্রমী, সহজ-সরল সাঁওতালদের খুব ভালবাসতেন। সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় এবং বড়দের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুটোতেই তিনি পড়াতেন। অসুখ-বিসুখে তিনি তাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করতেন।

শেষের কথা

১৮৭৫ সালে নিজ হস্তাক্ষরে একটি উইল লিখে বিদ্যাসাগর তাঁর সম্পত্তির থেকে ৪৫ জন প্রাপকের জন্য নিয়মিত মাসোহারার নির্দেশ দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এঁদের মধ্যে ২৬ জনই ছিলেন তাঁর আত্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরের। উইলে তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তাঁর মায়ের নামে স্থাপিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত অর্থসংস্থান রাখেন। কিন্তু তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে অনৈতিক এবং পরিবারের পক্ষে মর্যাদাহানিকর কাজকর্মের জন্য উইলের সুবিধাভোগীদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন নি। এই উইলটি লেখার পর বিদ্যাসাগর আরও ১৬ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু উইলটির কোন পরিবর্তন করেন নি।

এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রখর মর্যাদাবোধসম্পন্ন একজন সাদাসিধে মানুষ। তাঁর পোষাক ছিল একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ধুতি, একটি চাদর এবং পায়ে একজোড়া চামড়ার চটি, যা 'বিদ্যাসাগরী চটি' নামে বিখ্যাত হয়। তিনি গাড়িভাড়া বাঁচাতে দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতেন। আবার কেউ সাহায্য চাইলে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁর দয়া এবং মমত্ববোধের অনেক কাহিনী আছে। ভারতীয় হিসাবে সম্মানহানিকর কোন কিছুর সঙ্গে তিনি কোনদিন আপস করেননি। তিনি ছিলেন একজন গর্বিত বাঙালী, তবে নবজাগরণের পথিকৃত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ভারতের পুনরুত্থানের আর এক মহানায়ক মহাত্মা গান্ধীর উক্তি – "পৃথিবীতে বিদ্যাসাগরের মত মানুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। বলা হয় যে ঈশ্বরচন্দ্র যদি ইউরোপের কোন দেশে জন্মাতেন, তবে ব্রিটিশরা যেমন নেলসনের নামে স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছে, তেমনি তাঁর নামেও গড়া হ'ত। তবে ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাঙালী হৃদয়ে উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত।"

তাঁর সমসাময়িক বাঙালী সমাজ বিদ্যাসাগরের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে তাকে ইঙ্গিত করে ১৮৯৫ সালের এক স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মহত্ব তাঁর দয়ায় নয়, তাঁর বিদ্যাতেও নয়, তা ছিল যে বিশেষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি নারীদের দেখেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে। ... । নিজদেশে তিনি ছিলেন নিতান্ত একাকী, এখানে তাঁর যেন নিজের মানুষ বলতে কেউ ছিল না। এই সমাজে তাঁর জীবন সুখের ছিল না। আর এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল কারণ তিনি ছিলেন সর্ব বিষয়েই ইহার বিপরীত।

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগর, যতদূর জানা যায়, যকৃতের ক্যান্সার রোগে ভুগে তাঁর উত্তর কলকাতার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'বীরসিংহের সিংহশিশুর' নির্ভীক বলিষ্ঠ চরিত্র ছিল অপরাজেয়, তাঁর শির ছিল চির-উন্নত ও সকল তুচ্ছতার উর্ধে। ন্যায্য সংগ্রামের পথ, তা যতই কন্টকাকীর্ণ হোক, তিনি কখনও ত্যাগ করেন নি।

তাঁর চরিত্রে পাণ্ডিত্য ও মমত্ববোধের এই বিরল সমাবেশ তাঁর বন্ধু কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন - বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে দীন যে, দীনের বন্ধু। মধুসূদন নিজেও ছিলেন বিভিন্নভাবে বিদ্যাসাগরের কৃপাধন্য, তাই তাঁর এই প্রশস্তি বিশেষভাবে অর্থবাহী।

গল্প আছে যে বিদ্যাসাগরের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সদ্য-প্রয়াত বিদ্যাসাগরের 'দর্শন' লাভ করেন। শ্রী গোস্বামী ছিলেন একজন সাধুপুরুষ এবং সেই সময় তিনি ঢাকাতে ছিলেন। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আহা, কি মনোরম দৃশ্য! দেবদূতেরা বিদ্যাসাগরকে ঘিরে রয়েছে এবং তাঁর রথটি নানারঙের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। বিদ্যাসাগর আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।" পরদিন ঢাকায় খবর এল যে আগের দিন বিদ্যাসাগর কলকাতায় দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর প্রয়াণদিবস ২৯শে জুলাই ১৮৯১।

গল্পটি নিঃসন্দেহে এই হিন্দু বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে একজন পরোপকারী ভালমানুষ তাঁর সুকর্মের জন্য সুন্দর পারলৌকিক জীবন ভোগ করেন। এটি কোন কোন অনুরাগীর চক্ষে বিদ্যাসাগরের সুউচ্চ ভাবমূর্তির প্রতিফলন। ■

নজরুলের চেতনায় মা

- মানিকচন্দ্র ঘোষ

দুর্গাপূজো বাঙালীর মাতৃশক্তি আরাধনার অঙ্গ। এ আরাধনায় পুরোভাগে রয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর অজস্র গানে ও গাঁথায়, তাঁর শক্তিরূপিণী মাতৃসাধনার প্রতিফলন। এ বছর আমাদের টোকিও বাঙ্গালী (Tokyo Bengali) র পুজোয় সেই পরম প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁর সৃষ্ট বাগিচার কিছু ফুলে এবারের পুজোয় অঞ্জলীর ডালি সাজাই। নজরুল গীতিতে মাকে খুঁজি। দেখি কেমন করে দুর্গতিনাশিনী দশভুজা মা ধরা দিয়েছেন কবি নজরুলের চেতনায়।

নজরুল বিশ্বাস করতেন মাতৃশক্তির আরাধনায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার অধিকার, কারণ মা জগৎ জননী। মায়ের পুজো বস্তুতঃ পক্ষে অমেয় মাতৃশক্তিকে কেন্দ্রে রেখে উৎসব; মহাজাগতিক শাশ্বত মাতৃত্বের উৎযাপন। তাই তিনি ইসলাম ধর্মালম্ববী হয়েও সকলকে মায়ের পুজোয় সমবেত হতে আহ্বান জানিয়েছেন; দ্বার্থহীন ভাষায় গেয়েছেন,

"আয় অশুচি আয় রে পতিত, এবার মায়ের পূজা হবে।
(যেথা) সকল জাতির সকল মানুষ নির্ভয়ে মা-র চরণ ছোঁবে।"

হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা নজরুলকে ব্যাথিত করেছে বারংবার । তিনি অনুভব করেছিলেন জগৎজননীর সত্যিকার স্বরূপ অনুধাবনের ব্যর্থতার জন্যে মানুষে মানুষে বিভেদ। তাই জানিয়েছেন সবাই এক মায়ের সন্তান। তিনি চেয়েছেন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ; সকল বিভেদ ও ধর্মীয় অবিশ্বাসের অবসান।

"জননীকে দেখেনি, তাই ভাইকে আঘাত হেনেছে ভাই, (আজ)
মাকে দেখে বুঝবি মোরা এক মা-র সন্তান সবে। (এবার)
ত্রিলোক জুড়ে পড়বে সাড়া মাতৃমন্ত্রের মাভৈঃ-রবে॥"

নজরুল তাঁর ভক্তি মূলক গানে বিশেষ করে আগমনী ও বিজয়া গানে বাঙালী মনের সমস্ত সংবেদনশীল অনুভূতির দ্বারগুলো এক এক করে খুলে দিয়েছেন। আবেগে আর বাৎসল্য রসে ভরে আছে তাঁর সৃষ্টি। তিনি সেই আনন্দময়ী জগৎ জননী মাকে দেখেছেন নানা ভাবে। তিনি দেখেছেন মাকে কখনও বা শিব সোহাগী পার্বতী, কালী ও দূর্গা রূপে, কখনও বা বাঙালী ঘরের সাধারণ মেয়ে উমা রূপে।

শিব ও পার্বতীর প্রেমের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন রাধা ও কৃষ্ণের অনন্ত লীলা তাঁর হরপ্রিয়া গীতি গ্রন্থে। সৈন্ধবীর মুখে মহাদেবের সত্য ও সুন্দর রূপের বর্ণনায় শ্যাম সুন্দর কেই দেখেছেন নজরুল ।

"মহাদেবী! সেই কথা এসেছি জানাতে– যে লীলা করেন তব শিব সুন্দর
শ্যামসুন্দর সাজে, রস-বৃন্দাবনে।
নওল কিশোর রূপ নব ঘনশ্যাম– মেঘ-অনুলিপ্ত যেন তুষার কৈলাস।
গলে ফণী-হার নাই দোলে বনমালা জটাজূট হইয়াছে চাঁচর চিকুর,
শশীলেখা হইয়াছে বাঁকা শিখী-পাখা বিষাণ হয়েছে বাঁশি, বাঘছাল তাঁর
হইয়াছে পীতধরা, মুনি-মনোহর।
শুনি সেই চপলের ঘরছাড়া সুর গোপিনীরা ধেয়ে আসে পাগলিনি হয়ে।"

ঠিক একই ভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনায় মা দুর্গার গৌরী রূপ শ্যামা মায়ের মধ্যে মিশে গিয়েছে। তিনি গেয়ে উঠেছেন,

"আমি সাধ করে মোর গৌরী মেয়ের নাম রেখেছি কালী।
পাছে লোকের দৃষ্টি লাগে মাখিয়ে দিলাম কালি
তার, সোনার আঙ্গে মাখিয়ে দিলাম কালি॥
হাড়ের মালা গলায় দিয়ে দিয়েছি তার কেশ এলিয়ে,
তবু, আনন্দিনী নন্দিনী মোর দেয় রে করতালি।

আগমনী গানে, শরৎ কালে শ্বশুর বাড়ি কৈলাশ থেকে উমার ঘরে আসতে দেরি দেখে মায়ের মনের অস্থিরতার কথা নজরুল যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা যেন যে কোনো বাঙালী মায়ের মনের কথা। তাই এ গান হয়ে উঠেছে হৃদয় স্পর্শী-আবেগে, বাৎসল্য রসে, আর ভক্তিতে ভরপুর।

"আমার) আনন্দিনী উমা আজও এল না তার মায়ের কাছে।
হে গিরিরাজ দেখে এসো কৈলাসে মা কেমন আছে॥"

পুজো পর্বে, বাপের ঘরে দশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তিতে সাধারণ উমার হঠাৎ উত্তরণ মায়ের মনে স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময় জাগায়। মা মেয়েকে আদরের উমা হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত। তাই মেয়েকে দেখে মায়ের মন খুঁজে ফেরে রণরঙ্গিণী দূর্গা মূর্তির মধ্যে দুলালি মেয়ে উমাকে, যাকে

সহজে কাছে টানা যায় ; স্নেহ করা যায়। নজরুল মা ও মেয়ের এ মধুর অনুভূতির ও সম্পর্কের দিকটা তুলে ধরেছেন তাঁর সাবলীল অনবদ্য ভাষায়।

"আমার উমা কই, গিরিরাজ, কোথায় আমার নন্দিনী?
এ যে দেখি দশভুজা এ কোন রণরঙ্গিণী॥
মোর লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে, এ কোন দেবীমূর্তি নিয়ে এলে।
এ যে মহীয়সী মহামায়া বামা মহিষমর্দিনী॥"

অন্যান্য গীতিকারদের মতো কবি নজরুলও তাঁর রচনায় বিশেষ করে আগমনী ও বিজয়া গানে মানুষের সুখ ও দুঃখের কথা বর্ণনা করেছেন উমার সঙ্গে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। স্যাম্যবাদী কবি নজরুল ধনী দরিদ্র ব্যবধান মুক্ত , সকল রকম ভেদাভেদহীন বিশ্বের জন্যে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে মাকে কৈলাশে না ফিরে যাওয়ার জন্যে মিনতি করেছেন তাঁর লেখা বিজয়া গানে।

"এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্‌বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন॥
সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ সেই হবে তোর পূজা-বেদি
মা তোর পীঠস্থান।
(সেথা) শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতব মা তোর সিংহাসন॥
(সেথা) রইবে নাকো ছোঁয়াছুঁয়ি উচ্চ-নীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিবে মাতৃনামের বেদ।
(মোর) এক জননীর সন্তান সব, জানি ভাঙব দেয়াল, ভুলব হানাহানি,
দীন দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন।
বিশ্ব হবে মহাভারত নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন॥"

এমনি করেই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর অনেক গানে তদানীন্তন সামাজিক সমস্যার কথা। তিনি মা দুর্গাতিনাশিনী দুর্গাকে জানিয়েছেন অসহায় দীন দরিদ্র মানুষের কষ্টের কথা; জানিয়েছেন অসুর ও দানবের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়নি এ ধরা।

"(আজও) মরেনি অসুর, মরেনি দানব, ধরণির বুকে নাচে তাণ্ডব,
সংহার নাহি করি সে-অসুরে কেন যাস্ বিজয়ায়॥"

মায়ের প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অপরিসীম। নজরুল তাঁর অনেক ভক্তিগীতিতে মায়ের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করে অন্তরের ভক্তি নিবেদন করেছেন; মায়ের সান্বিধ্য পাওয়ার জন্যে আকুতি জানিয়েছেন।

"((আমার) মুক্তি নিয়ে কী হবে মা, আমি তোরে চাই।
স্বর্গ আমি চাই না মা গো কোল যদি তোর পাই।"

মায়ের কাছে তাঁর আত্ম নিবেদন মায়ের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ও বিশ্বাসকে প্রমাণ করে।

নজরুলের ভক্তিগীতি বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি; তাঁর মাতৃ সাধনার ফসল; তাঁর উদার ধর্মীয় চেতনার প্রতিফলন। আসলে নজরুল ভারতীয় সনাতনী সংস্কৃতির মূল সুরকে অনুভব করেছেন তার আধ্যাত্মিক ভাবনার ভিতর দিয়ে। তিনি দেখেছেন সেই শাশ্বত নিরাকার সত্যের প্রকাশকে সাকাররূপে বিভিন্ন দেব ও দেবীর মধ্যে। এ চেতনাই নজরুলের মাতৃশক্তি আরাধনায় নতুন মাত্রা এনেছে। তাই তাঁর সৃষ্ট ভক্তিগীতি হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক সাধনার সোপান।

এবারে টোকিও বাঙালী (Tokyo Bengali)র শারদউৎসবে নজরুলের আধ্যাত্মিক চেতনার আলোয় আজ এ শুভ ক্ষণে মায়ের আরতি করি; শাশ্বত জাগতিক মাতৃস্বত্বার প্রতিমূর্তি মা দুর্গার উদ্যেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই; মাকে প্রণাম করি। ■

কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ

- ভাস্বতী সেনগুপ্ত ঘোষ

কবিগুরুর লেখা বই অথবা কবিগুরুর প্রসঙ্গে লেখা গুনীজনের বই আমাকে নিবিষ্ট করে রাখে। যতবারই পড়ি সেইসব বই –ছাড়তে ইচ্ছে করেনা, ছাড়তে কষ্ট হয়। বর্তমান প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে, যখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বিপর্যস্ত; তখন এই প্রাত্যহিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও সঙ্কটের উর্ধ্বে মনকে কিছুক্ষনের জন্য হলেও ভারমুক্ত করা ও আনন্দ দেওয়া –এই লেখার প্রেরনা। আমার মত অসংখ্য রবীন্দ্র অনুরাগী ও বাংলা পাঠক-পাঠিকা,সাহিত্যপ্রেমী নিশ্চয়ই এটি অনুধাবন করতে পারবেন। কবিগুরুর কৌতুক প্রিয়তা সম্বন্ধে সব ঘটনা এখানে লেখা অসম্ভব, তাই সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি ও আশা রাখি এই লেখা পাঠকদের আমারই মত আনন্দ দেবে।

“(অভিজিৎ) সে গুরুদেব-দাদুকে বাইরে দেখেই ছুটে এল, এসেই দাদুর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, বললে, জানো দাদু, তোমার সব কবিতা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি, আর একটাও বাকি নেই।

গুরুদেব বললেন, সত্যি নাকি? সব শিখে ফেলেছ?

- হ্যাঁ দাদু। স---ব।

–তা হলে তো তোমার জন্য আবার আমার নতুন করে কবিতা লিখতে হবে দেখছি। গুরুদেব ও অভিজিতের কথা জমে উঠল। উচ্ছাসের ধাক্কায় অভিজিৎ ডান হাঁটুটা গুরুদেবের কোলের উপর তুলে দিয়ে বলল, জানো দাদু, আজ কোন কবিতাটা শিখেছি? শোনো –

“পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল- সুহিদ্ গঞ্জে রক্তবরন হইল ধরণীতল।

কবিতার মধ্যে ‘পাঠা’ আর ‘রক্ত’ এই দুটোই বুঝেছিল সে। তাই বললে, এর মানে কি জানো দাদু? গুরুদেব মাথা নাড়লেন। অভিজিৎ গুরুদেবের মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাতে শুরু করে দিল, এর মানে হল –পাঁঠাগুলিকে বেঁধে নিয়ে এল-কাটল, আর রক্ত-রক্ত- বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানি যতটা পারল সামনে বাড়িয়ে দিল। দু-চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। ভাবখানা- যেন অতি বিস্ময়কর একটা ব্যাপার দেখাচ্ছে সে তার গুরুদেব দাদুকে। গুরুদেব প্রান খুলে হেসে উঠলেন .বললেন, তাই তো গো, এমন মানে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানে না গো।

(গুরুদেব—শ্রীমতি রানী চন্দ, পৃষ্ঠা—১৪০, ১৪১)

সুরেন্দ্রনাথের দুই মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রী। জয়শ্রী নির্বাচন করেছিলেন কুলপ্রসাদ সেনকে। অসবর্ণ বিবাহ বলে পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী আপত্তি উঠেছিল, ব্রাক্ষণে-অব্রাক্ষণে বিয়েতে মহর্ষির প্রবল আপত্তি ছিল। এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অসবর্ণ বিয়ে হলেও রেজিস্ট্রি করা হয়নি। আচার্যের কাজ করলেও কবি তখন এই বিয়ে উপলক্ষে কোনও কবিতা লেখেননি। এলাহাবাদে জয়শ্রী কবিকে অনুরোধ জানালেন একটি কবিতা লিখে দিতে। কবিও লিখলেন –

‘তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে ।
শাশুড়ি না বলে যেন,’কী বেহায়া বৌটা’......।

(ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল- শ্রীমতী চিত্রা দেব, পৃষ্ঠা- ১৬৩)

এবার আসি অন্য ঘটনায়। কবিগুরু যে মংপু খুব ভালবাসতেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহন করেছেন সেটা সর্বজনবিদিত। মংপুর কমলাবনের উৎকৃষ্ট মধু ও শীতকালে কমলালেবু কবির প্রিয় ছিল। লেবুগুলি পাঠভবনের ছেলেদের ডেকে খাওয়াতেন।

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৬ উত্তরায়ন শান্তিনিকেতন

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মউচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পারো ডাকে
বিলাতী শুগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
গুড়ং দদাৎ বানী বলে কবিরাজে।
দায়ে পড়ে তাই
লুচি পাঁউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই,--
বিমর্ষ মুখে বলি গুড়ং দদাৎ
সে যেন গদ্যের দেশে আসি পদাৎ।

খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিঃশ্বাস ফেলে বলে সকলি অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য
গৌড়ী গদ্য হতে পদ্যময় পদ্য
দর্শন দিতে পারে সদ্য ।।
ইতি -
রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবীর কন্যাকে লেখা চিঠি...

মিঠুয়া-(মৈত্রেয়ী দেবীর যত্নাধীনে) শান্তিনিকেতন ১৭/৩/৪০

মিঠুয়া

দাদুরে যে মনে করে লিখেছ এ চিঠি

তাই ভাবি দাদুতেও আছে কিছু মিঠি ।
সেটা কি অহৈতুকী প্রীতি অথবা চকোলেটের স্মৃতি ?
এ কথাটা সংসারে নয় খুব সোজা
হয়তো বছর কয় যাবে নাকো বোঝা
তবু যদি লিখে রাখি তাতে ক্ষতি নেই
সংক্ষেপে এই
ভিতরে এনেছ তুমি বিধাতার চিনি
আমি সে বাহির হতে বাজারেতে কিনি –
দাদু (শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
(স্বর্গের কাছাকাছি – শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী -- পৃষ্ঠা ২৬১,২৬২,২৬৩)

আবার আসি শ্রীমতী রানী চন্দের কথায়......

"সহজ হৈ চৈ তাঁকে (গুরুদেবকে) বড়ো আনন্দ দিত। এক বর্ষায় বর্ষামঙ্গলের রিহার্সেল হচ্ছে উদয়নের পশ্চিম-বারান্দায়। নাচগানে প্রতি সন্ধ্যা জমে ওঠে সেখানে......

গুরুদেব বললেন, বর্ষামঙ্গলটা হয়ে যাক, তারপরেই আমরা করব ভরসামঙ্গল। পরদিনই 'ভরসামঙ্গলে'র রিহার্সেল শুরু হয়ে গেল। ......আমরাও জড়ো হই জনকয়েক মিলে মজা দেখতে। গুরুদেবকে এসে পরে বর্ণনা দিই। শুনে গুরুদেবও হাসেন। বলেন, আমিও একটা গান লিখে দেব ওদের জন্য –

পরদিন আরো দুটো গান লিখলেন –

'ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ,
তিনটে-চারটে পাস করেছি, নই নিতান্ত মুকখ।।
তুচ্ছ সা-রে-গা-মা'য় আমায় গলদঘর্ম ঘামায়,
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম –
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে, এই বড়ো মোর দুঃখ।।

আর......

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে।

(গুরুদেব – শ্রীমতী রানী চন্দ -- পৃষ্ঠা ৬২, ৬৩)

তখনকার দিনে দার্জিলিং যাওয়া আজকের মতো সহজ ছিলনা। সেইযাত্রার এক চলমান ছবি ইন্দিরা দেবীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি......

দার্জিলিং , সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

"সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাঁম। রাত্রি দশটা- জিনিষপত্র সহস্র, কুলি গোটাকয়েক, মেয়েমানুষ পাঁচটা এবং পুরুষমানুষ একটিমাত্র, নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়ীতে ওঠা গেল—তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাখন-সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিষপত্র Ladies Compartment এ তোলা গেল—কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয়নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয়নি- তবু নদিদি বললেন আমি কিছুই করিনি। অর্থাৎ, আমার মতো ডাগর পুরুষমানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে প্ল্যাটফর্ম –ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ, একখানা আস্তমানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্তি ধারন করলে ঠিক পুরুষমানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠাণ্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed । কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটেনি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে, কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারি, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের—নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা—তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দিনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়—অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক—আমি বিবিধ-বিচিত্র-মুর্তি বাক্সের মধ্যে পড়ে কী এক রকম হয়ে গিয়েছিলাম। সুরেনকে বলিস আমার এই অবস্থার একটি ছবি আঁকতে । যাক। তার পরে আমি আর-একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম।"

......সেপ্টেম্বর ১৮৮৭, ছিন্নপত্রাবলী

নিজেকে নিয়ে সরস ঠাট্টা –মোটেও সহজ নয়।স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কী অবলীলায় তা করতে পারেন, এটা তারই একটা উদাহরণ। ঠাকুরবাড়ির এক ঝাঁক মহিলার সঙ্গে এসকর্ট রুপে চলেছেন ছাব্বিশ বছরের যুবক, রবীন্দ্রনাথ। ভাদ্রের পচা গরম থেকে কিছুকালের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় দার্জিলিং যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল।

কবিগুরুকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে গবেষনা ও প্রকাশনা হয় এবং হয়ে চলবে কারন উনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। বাংলায় কবিগুরুর মতই বহু মনিষী ও মহামানব জন্মগ্রহন করেছেন এবং যুগের পর যুগ তাঁরা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, বাংলা তথা ভারত তাই গর্বিত ও ধন্য। কবিগুরুকে ও সকল মহামানবকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রনাম জানাই।

গ্রন্থ ঋণ...... গুরুদেব – শ্রীমতী রানী চন্দ
স্বর্গের কাছাকাছি –শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
ছিন্নপত্র – শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ধ্রুবপদ – বার্ষিক সংকলন –শ্রী সুধীর চক্রবর্তী।

বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়

- পার্থ কুমার

যে ক'জন বাঙালিকে নিয়ে আমাদের গর্ব চিরকালীন, তাঁদের অন্যতম সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী ছিল এই বছর । সত্যজিৎ রায় চিত্রপরিচালক হিসাবে সমাদৃত হলেও আমাদের অনেকের কাছে ওনার প্রথম পরিচয় লেখক হিসাবে। যদিও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে তিনি গোল্ডেন লায়ন, গোল্ডেন বিয়ার, সিলভার বিয়ার, অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন, ওনার অনেক বড় অবদান বাংলা কিশোর সাহিত্যে। শুধুমাত্র লেখক হিসেবেই কি তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য স্থান অধিকার করেন না? গোয়েন্দা ফেলুদা থেকে বৈজ্ঞানিক প্রফেসর শঙ্কু কিংবা মজলিশি তারিনীখুড়ো, প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে অভিযান প্রিয় বাঙালির অনুসন্ধিৎসু মননের ঝলক দেখা যায়। সত্যজিতের লেখার ছত্রে ছত্রে সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস আর বিজ্ঞানের সহজপাঠ। খুব সহজ সরল ভাষায় যিনি কিশোর পাঠকদের অজানাকে জানার কৌতূহল জাগিয়েছেন ওনার রচনায় ।

বাঙালি লেখকরা ২০০ বছরেরও বেশি সমৃদ্ধ সাহিত্য ইতিহাসে বহু গোয়েন্দা চরিত্র উপহার দিয়েছেন । কিন্তু, রায়ের সৃষ্টি "ফেলুদা" কোনও সন্দেহ ছাড়াই তাদের সবার মধ্যে সেরা বলা যেতে পারে। বেশিরভাগ ভারতের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসগুলি কিশোর পড়ুয়াদের সাথে প্রবীণ পাঠকগণ

ফেলুদা বইয়ের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপট

দ্বারাও সমাদৃত। ১৯৬৫ সালে ফেলুদার প্রথম গল্প পত্রিকায় প্রকাশ হতেই তা পাঠক মহলে সমাদৃত হয়। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ফেলুদা সিরিজের মোট ৩৫ টি সম্পূর্ণ ও চারটি অসম্পূর্ণ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সিরিজের সমস্ত গল্পে ফেলুদাকে দেখা যায় মগজাস্ত্রের উপর ভর করে জটিল থেকে জটিলতর রহস্যের জট খুলে দিতে।

কলকাতার ২১ নম্বর রজনী সেন রোডএর বাসিন্দা শখের গোয়েন্দা প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদার বিচরণক্ষেত্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সীমা পেরিয়ে মহারাষ্ট্র, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এবং শেষের দিকে নেপাল, হংকং ও লন্ডন এ পৌঁছয়। তাঁর দুই সঙ্গী ভাইপো তোপসে ও গরপাড় রোড বাসি লালমোহন গাঙ্গুলি বা জটায়ুকে নিয়ে যাবতীয় রহস্য সমাধান করে যান। ফেলুদার কথা বললে আর দুই চরিত্রের নাম না করলে লেখা অসমাপ্ত থেকে যায়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সর্দার শঙ্কর রোডএর বাসিন্দা সিধু জ্যাঠা বা সিদ্ধেশ্বর বোস। তিনি একজন বয়স্ক চরিত্র, যিনি নিজেকে শার্লক

হোমসের ভাই মাইক্রফ্টের মতো বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া, ফটোগ্রাফিক স্মৃতির অধিকারী ফেলুদার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান ফেলুদার অনুসন্ধানের কাজে প্রায়শই শেষ অবলম্বন। আর একজন হচ্ছেন মগনলাল মেঘরাজ। বেনারসবাসি মগনলাল হলেন এক খলনায়ক চরিত্র যিনি ফেলুদার তিনটি গল্পে আছেন। তিনি একজন সুদের কারবারি তবে তার আসল ব্যবসা দুষ্প্রাপ্য শিল্পকর্ম চোরাচালান, মাদক ব্যবসা আরও অনেক অবৈধ ব্যবসা।

সেই চারমিনার হাতে চিন্তাশীল ফেলুদা'তে আজও মজে বাঙালি। ছোটবেলায় পড়া আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসে প্রভাবিত হয়েই ফেলুদা চরিত্রের সৃষ্টি সত্যজিতের। তাই ফেলুদা সিরিজের বিভিন্ন চরিত্রের সাথে অনেক জায়গায় শার্লক হোম সিরিজের কিছু চরিত্রের মিল দেখতে পাই। সৃষ্টির এতবছর কেটে গিয়েছে, ফেলুদা আজও পাঠকের কাছে সমান সমাদৃত।

প্রফেসর শঙ্কুর বইয়ের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপট

যদিও ফেলুদা ওনার সৃষ্টিত চরিত্রগুলির মধ্যে প্রথমস্থান পায় , কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সৃষ্টি প্রোফেসর শঙ্কু বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যেও এক অনন্য চরিত্র। তিনি বিজ্ঞানের আগ্রহী পাঠক ছিলেন এবং আর্থার সি ক্লার্কের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

প্রফেসরের সৃষ্টি খানিকটা জুলুস ভার্ন, এইচজি ওয়েলস, আইজ্যাক আসিমভ এবং আর্থার সি ক্লার্কের মতো অগ্রণীদের কাজ থেকে অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের বহু-মুখী ব্যক্তিত্বের তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত দিকটি প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে লেখা মোট ৩৮ টি সম্পূর্ণ ও ২ টি অসম্পূর্ণ গল্পে শাশ্বত হয়ে আছে।

জীবনের কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি সেই প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্রের মাধ্যমে তিনি পাঠকের সামনে খুলে দেন কল্পবিজ্ঞানের এক অবাধ জগৎ। গিরিডির বাসিন্দা ও স্কটিশচার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শঙ্কু পদার্থ বিজ্ঞানী হলেও বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি ৬৯ টি ভাষা জানেন, হায়ারোগ্লিফিক লিপি অবধি পড়তে পারেন। বিশ্বের প্রায় সব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে যাঁর অঢেল জ্ঞান। আবার ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শঙ্কু একইসঙ্গে শ্রদ্ধা করেন সমগ্র বিশ্বের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পকর্মকে। প্রোফেসর শঙ্কু ক্রমাগত নতুন উদ্ভাবনএর মাধ্যমে পশ্চিমের উদ্ভাবনগুলিকে সহজেই তার স্বল্প খরচে এবং দেশি পদ্ধতিতে তৈরী যন্ত্রের কাছে হার মানান। পুরো সিরিজ জুড়ে প্রোফেসরের মোট ৭২ টি আবিষ্কার সম্পর্কে জানা যায়। এই আবিষ্কারের নামকরণের ক্ষেত্রেও সত্যজিৎ রায়ের কৌতুকবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, শঙ্কু আবিষ্কৃত রোবট বিধুশেখর সাধু ও চলিত বাংলায় কথা বলতে পারে; আবার তৃষ্ণানাশক বড়ির নাম 'তৃষ্ণাশক বড়ি'। শঙ্কুর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল বটিকা ইন্ডিকা, এয়ারকন্ডিশানিং পিল, লিঙ্গুয়াগ্রাফ, লুমিনিম্যাক্স, সমুনলিন, রিমেম্ব্রেন, মিরাকিউরল,শ্যাঙ্কোপ্লেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র অ্যানাইহিলিন পিস্তল, যার উল্লেখ অনেকগুলি গল্পে আছে।

প্রফেসর শঙ্কু গল্পেরও পটভূমি ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। তাঁর অভিযান কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, মিশর, জার্মানি, জাপান, স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন, তিব্বত, সাহারা মরুভূমি থেকে সমুদ্রের

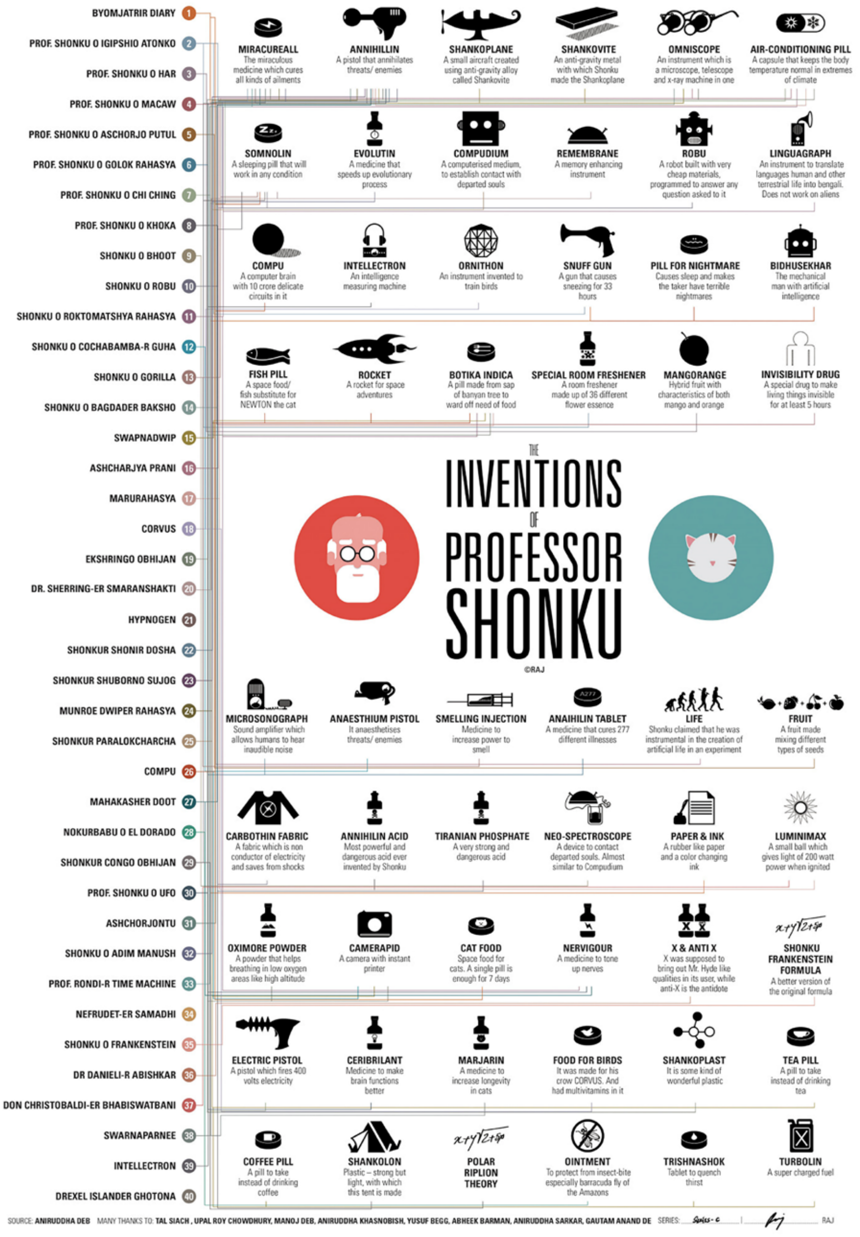

তলদেশ, অজানা দ্বীপ ছুঁয়ে যায়। অভিযানে তার সঙ্গী অবিনাশবাবু অথবা জার্মান বৈজ্ঞানিক ক্রল এবং ইংরেজ গবেষক স্যান্ডার্স। আবার কখনো জাপানি বৈজ্ঞানিক হামাকুরা ও তানাকার সঙ্গে শঙ্কু ভিন গ্রহের প্রাণীর সন্ধানে সমুদ্রের তলদেশে, কখনো মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডাম্বার্টনের সঙ্গে একটি সদ্য-আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক গুহা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার বছর বয়সী গুহামানবের মুখোমুখি, কখনো ইংরেজ প্রাণীতত্ত্ববিদ ম্যাসিংহ্যাম ও তার গেরিলা বাহিনীর কব্জায়।

এই গল্প গুলো ১৯৬১ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সন্দেশ , আনন্দমেলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা আর সন্দেশের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রফেসর শঙ্কুর নতুন উপন্যাস। পরবর্তীকালে বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের অনেক লেখক এলেও মধ্যবিত্ত বাঙালির এডভেঞ্চার এর নেশা আর অনুসন্ধিৎসু মন পরিপূর্ণতা পায় তাঁর সৃষ্টি প্রফেসর শঙ্কুর মাধ্যমে।

এক ডজন গপ্পো ও অন্যান্য বইয়ের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায় অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছেন যেগুলো বারটির সংকলনে প্রকাশ করা হয়। মোট সাতটি বই প্রকাশ করা হয় ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ এর মধ্যে। এই সংকলন গুলিতে এতো মণিমুক্তো আছে যা স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয় । এই ছোটগল্পগুলোতে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা, ভয় তো আছেই আর আছে কল্পবিজ্ঞান, অলৌকিক ঘটনা আর কঠিন বাস্তব। ছোট গল্পগুলির সবচেয়ে চমকপ্রদ দিকটি হ'ল এগুলো তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে শুরু করে বিস্ময়কর শেষ। একদিকে মধ্যবিত্ত আশা, কৌতুক এবং কল্পনা, অন্যদিকে, দৈনন্দিন বাস্তবতার নিখুঁত সামঞ্জস্যের সহাবস্থান। তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে রায় ছিলেন উপেক্ষিত মানুষের সমর্থক। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, "আসলে, আমি সব ধরণের গল্প লিখেছি, তবে আমি সাধারণত নিঃসঙ্গ মানুষ এবং তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি সম্পর্কে লিখতে পছন্দ করি।" এই গল্পগুলির কিছু কিছু চলচিত্র বা টিভি সিরিয়াল হয় পরবর্তী কালে।

ওনার অন্যান্য রচনার মধ্যে তারিণী খুড়ো আর এক অমর চরিত্র। ষাট পেরোনো তারিণী খুড়ো যুবক বয়স থেকে নানা ধরনের চাকরি করতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার গল্প শোনান বাচ্চাদের। সেখানে আবার লেখক পাঠকের কাছে উজাড় করে দেন ভূতের ও হাসির গল্পের ঝুলি। যার অধিকাংশ গল্পে দেখা যায় উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে কীভাবে একের পর আসন্ন বিপদকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তারিণী খুড়ো।

মোল্লা নাসিরুদ্দিন মধ্যপ্রাচ্যের গল্প হলেও বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে বেশ জনপ্রিয়। তাকে বাংলা পাঠকমহলের কাছে পরিচিতি দেওয়ার ভার নিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসেবে পরিচিত মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে দেখা যায় একদিকে একজন প্রাজ্ঞ মানুষ ও দার্শনিক হিসেবে, আবার কোনও গল্পে তিনি হদ্দ বোকা। সত্যজিৎ রায়ের আরও অনেক রচনার মধ্যে ফটিকচাঁদ, যখন ছোট ছিলাম আর একেই বলে শুটিং উল্লেখযোগ্য ।

সত্যজিৎ রায়ের নিজের যৌবনের কল্পনার প্রভাবগুলি তাঁর গল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যাদুর প্রতি তাঁর মুগ্ধতা, দুর্দান্ত এবং অতিপ্রাকৃতের প্রতি তাঁর ঝোঁক স্পষ্ট। হয়তো তিনি চলচ্চিত্রে যা করা সম্ভব নয়, সেই দিকগুলি তাঁর লেখায় উপভোগ করেছিলেন। তবে তাঁর সাহিত্য আরও গভীরভাবে অনুভব করলে বোঝা যায় যে এর সামান্য পটভূমির নীচে একটা গভীর নদী বয়ে চলেছে যেটি তাঁর মানবতাবাদী জ্ঞান এবং সংবেদনশীল মনের প্রতিবিম্ব। জীবনের গভীর পর্যবেক্ষণের সাথে আবেগের দৃঢ় লাগাম, সাথে বাস্তববাদী, মানবিক মূল্যবোধের জয়জয়কারে উজ্জ্বল, সরলতা, নৈতিকতা এবং সর্বোপরি ন্যায়বিচারের শিক্ষা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি।

সত্যজিতের লেখার মূল লক্ষ্য ছিল কিশোর তরুণ পাঠক বর্গ, যদিও তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে বড্ড প্রিয়। সাহিত্যিক হিসেবে এরচেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে! আমাদের শৈশবের দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটির দুপুরগুলিতে তাঁর বই না থাকলে জীবন হয়তো অন্যরকম হত। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য কেবল আমারা অজানাকে খুঁজতে বেরোইনি , সত্যকে অনুসন্ধান করতেও তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন । সত্যজিতের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং বর্তমানে তাঁর বইগুলোর দ্বিতীয় প্রজন্মের পাঠকসমাজ গড়ে উঠেছে। আশা করি আগামী প্রজন্মের পাঠকেরা ওনার রচনাকে সমানভাবে সমাদৃত করবেন। ■

তথ্যসূত্র:

1. Satyajit Ray: The Inner Eye: The Biography of a Master Film-Maker : Andrew Robinson
2. Satyajit Ray: Interviews (Conversations With Filmmakers Series) : Bert Cardullo
3. সত্যজিৎ রায় রেডিও ইন্টারভিউ - অমিত চক্রবর্তী https://www.youtube.com/watch?v=GicoRyqcY9c
4. Satyajit Ray interviewed | Pierre Andre Boutang | https://www.youtube.com/watch?v=9H_lX2FRhxw
5. South Bank Show- Satyajit Ray Interview | https://www.youtube.com/watch?v=-alvizeAHm0&t=1079s
6. Conversation with Satyajit Ray | Gideon Bachmann | https://www.youtube.com/watch?v=sTOpURHaZUg
7. Celebrating 100 years of Satyajit Ray: Satyajit Ray's best-kept secret: by Gulzar https://www.hindustantimes.com/brunch/celebrating-100-years-of-satyajit-ray-satyajit-ray-s-best-kept-secret-by-gulzar-part-3/story-reald58fVE8KeOXlGaeLML.html
8. Inventions of Professor Shonku - https://visual.ly/community/Infographics/entertainment/inventions-professor-shonku

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে, মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

পরনে গরদের শাড়ী, গলায় ছোট রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে একটু লম্বা সাদা টিপ। এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, মনে হয় যেন সর্বদা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে।

তিনিই প্রবাদপ্রতিম নৃত্যগুরু শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি অমলা শঙ্কর, আমাদের প্রিয় মাসিমা।

পৃথিবী জোড়া খ্যাতি তাঁর। আজকাল google, wikipedia খুঁজলে আমরা অনেকটাই জানতে পারি। তাঁর অবস্থান, তাঁর কীর্তি, তাঁর সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় সবটাই। আজ লিখতে ইচ্ছে করছে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা। স্মৃতিচারন করতে বসে খেই হারিয়ে ফেলছি। কত যে অভিজ্ঞতা। আমার পরম সৌভাগ্য আমি মাসিমার স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছি।

ছোটবেলায় দাদু দিদা, বাবা মায়ের কাছে তাঁদের দেখা শঙ্কর স্কোপ'য়ের গল্প অনেক শুনেছি। তারপর মমতাশঙ্কর ব্যালে ট্রুপে অংশ নেবার পর মাসিমাকে কাছ থেকে দেখেছি। বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়ে আস্তে আস্তে বুঝেছি বা বলা যেতে পারে বোঝার চেষ্টা করেছি উদয়শঙ্কর নৃত্যঘরাণার গভীরতা।

কোলকাতায়, দিল্লীতে একই মঞ্চে মাসিমার তত্ত্বাবধানে 'উদয়শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচার সেন্টার'য়ের কলাকুশলীরা আর মমদির (শ্রীমতি মমতাশঙ্কর) তত্ত্বাবধানে আমরা অর্থাৎ মমতাশঙ্কর ব্যালে ট্রুপ। গ্রীনরুমে কত গল্প শুনিয়েছেন স্বামী নৃত্যগুরু উদয়শঙ্করের। মুগ্ধ হয়ে শুনেছি, কেবল শুনেছি। আজ এতদিন পর ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয় এমন সব অভিজ্ঞতা।

একটি মজার ঘটনা মনে পরছে। আমরা কখনও কখনও কোলকাতার বাইরে অনুষ্ঠান করতে যেতাম বাসে করে। অনুষ্ঠানের দিন সকালে বাস দাঁড়াতো অফিসের সামনে। আমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে বাসে উঠতাম। মমদি আগেরদিন রিহার্সাল শেষ করে মায়ের কাছে ছিলেন। তাই আমাদের বাস মাসিমার জয়জয়ন্তী ফ্ল্যাটের নীচে থামলে, মমদি উঠে আসতেন বাসে। আমরা সবাই বাসের জানলা দিয়ে হাত জোড় করতাম মাসিমার ১০তলার ঝোলানো বারান্দার দিকে তাকিয়ে। ওখানে দাঁড়িয়ে কি সুন্দর সব মুভমেন্ট করতেন আর তারপর আশীর্বাদ করতেন আমাদের।

বিয়ের পর প্রথম জুন কোলকাতায় গেলে মাসিমা যেতে বললেন। সকালে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন রাশিয়া থেকে আগত কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে ইন্টারভিউ ছিল। তারমধ্যেই সময় বার করেছিলেন আমাদের জন্য। এই ভাগ্য ক'জনের হয়! অনেকক্ষন গল্প হয়েছিল সেদিন, মনে আছে। জাপানের নতুন পরিবেশে আমার দিন কিভাবে কাটছে, আমি নাচ শুরু করেছি কিনা ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জুনের সঙ্গেও অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। আমি ছিলাম দোভাষীর ভূমিকায়। তখনতো মোবাইলের যুগ নয়, আর এসব জায়গায় ক্যামেরা বার করতেও ইতস্তত বোধ হয়। মাসিমার সম্মতিতেই ২/৩টে ছবি তুলেছিল জুন।

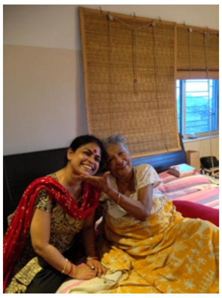

যতবার গ্রুপ নিয়ে কোলকাতায় উদয়শঙ্কর নৃত্য উৎসবে অনুষ্ঠান করেছি, মাসিমা রবীন্দ্রসদনের প্রথম সাড়িতে বসে অনুষ্ঠান দেখেছেন। অনুষ্ঠানের পর দেখা করেছি ব্যাকস্টেজে ট্রুপ নিয়ে। একটা একটা নাচ ধরে ধরে খুঁটিনাটি বলেছেন। মেয়েদের নাচের প্রশংসা করতেন সবসময়। প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাসিমার নিজের ফ্ল্যাটে একা থাকাটা মমদির জন্য বেশ চিন্তার কারণ হয়। মমদি নিয়ে এলেন মাকে নিজের কাছে। বয়স ৯০ ক্রস করেছে। তখন মাসিমা আর নাচতেন না। কিন্তু অবচেতন মনে নিজের গ্রুপ, নিজের স্কুল, নাচ নিয়ে এত ভাবতেন, শুনেছি মাঝেমধ্যেই ঘুম থেকে উঠে বলতেন গাড়ি এসে গেছে? শোয়ের ট্রাঙ্ক ঠিকমত উঠেছেতো? আবার তখন বোঝানো হোত...এইভাবেই চলছিল। একদম স্পষ্ট কথাবার্তা বলতেন। কোলকাতায় মমদির বাড়ি গেলে পাশে বসিয়ে সব জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

গতবছর (২০১৯) ১০০বছর পূর্ণ হোল। ২০২০র জুন মাসে ১০১বছর। আর তারপর ২৪শে জুলাই সারা বিশ্ব যখন অসম্ভব অস্থিরতার মধ্যে ধুকতে ধুকতে চলছে সেই সময় ঘুমের মধ্যেই নীরবে চলে গেলেন অনন্তধামে। মহাশ্মশাণে গানস্যালুটের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হোল বিদেহী আত্মার প্রতি। শোকস্তব্ধ হোল পৃথিবী। রেখে গেলেন কালজয়ী সব সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্য দিয়েই চিরজীবন বেঁচে থাকবেন নৃত্যগুরু শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি অমলাশঙ্কর।

মাসিমার সঙ্গে তোলা আমার একটি ছবি পাঠিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুকে। বন্ধুর মামা সাংবাদিক শ্রী সুমন গুপ্ত। দৈনিক বর্তমান পত্রিকার রবিবারের পাতায় মাসিমার বর্ণময় জীবন নিয়ে দীর্ঘ ধারাবাহিক লিখেছিলেন। আমার পাঠানো ছবিটি দেখামাত্র তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে একটি চিঠি কপি করে আমার বন্ধু মারফত আমাকে পড়তে পাঠিয়ে দিলেন। মাসিমার নিজের হাতে লেখা চিঠি পড়লাম বারবার। চিঠির নীচে মাসিমার নিজের নাম সই করা। ভাবছিলাম খুব কাছ থেকে যাঁকে এতটা সময় দেখেছি। মুখ ফুটে কখনও বলতে পারিনি অটোগ্রাফের কথা। শেষবেলায় মাসিমা'ই বোধহয় আমায় আশীর্বাদস্বরূপ দিয়ে গেলেন তাঁর অটোগ্রাফের কপি।

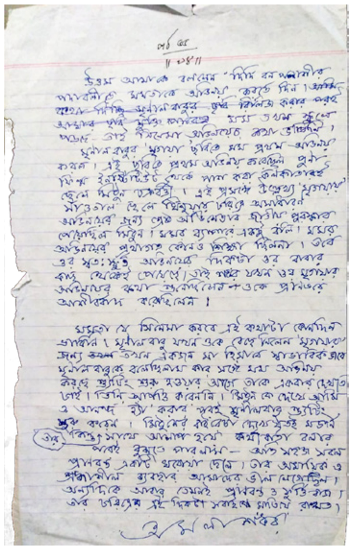

আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম মাসিমা। ■

কোলকাতার রোড-নামচা

- তপন কুমার রায়

একসময়ে কোলকাতার খুব সরু গলিকে বলা হত গলিস্য গলি তস্য গলি। এতে গলি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে দু দুবার ষষ্ঠী তৎপুরুষ ব্যবহৃত হলেও বিদ্যাসাগর মশায়ের ব্যাকরণ কৌমুদীতে এর কোন হদিস পাওয়া যাবে না। বাংলায় যে সব সরু রাস্তা দুধারে বাড়ীর মাঝখান দিয়ে যায় তাকে গলি বলা হয়। ইংরিজিতে এর প্রতিশব্দ হল লেন। আর যে সব গলি আরও সরু হয়ে আরেকটা গলির থেকে বের হয় তাকে বলা হয় বাই-লেন যাকে রসিকতা করে চলতি বাংলায় বলা হয়েছে তস্য গলি। গলি গিয়ে মিশেছে অপেক্ষাকৃত একটু চওড়া রাস্তায় আবার সেই রাস্তা গিয়ে মিশেছে তার থেকেও চওড়া আরেকটা রাস্তায়। এই ভাবে গলি থেকে রাজপথ নিয়ে কোলকাতা শহর যা একসময় পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতের রাজধানী ছিল। পৃথিবীর সমস্ত শহরের মত কলকাতাও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য তৈরি করে নিল তার স্থাপত্য, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি দিয়ে। এর সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার দিয়ে কোলকাতার সাংস্কৃতিক পটভূমি চিহ্নিত করা যায় তা হল শহরটার বিভিন্ন অঞ্চল আর রাস্তা ও ঘাটের নাম দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে কোলকাতা পত্তনের ইতিহাস একটু ঝালিয়ে নিলে বুঝতে সুবিধে হবে। সেই সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গঙ্গার পূবপাড়ে বাগবাজার আর বরানগর ঘিরে যে জনপদ আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে তা কোন পরিকল্পনা মাফিক হয় নি। অবস্থানগত হিসেবে কোলকাতা হল বিষুবরেখার উত্তরে ২২-১৩ অক্ষাংশে আর গ্রিনুইচের পূর্বে ৮৮-২৩ দ্রাঘিমাংশে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় একশ মাইল ভিতরে গঙ্গা নদীর পশ্চিম পাড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রায় ষোল থেকে আঠারো ফুট উঁচু এই শহর কোলকাতার অবস্থান। এই গঙ্গাকে ব্রিটিশরা বলত হুগলী নদী। স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দারা এই নদীকে পবিত্র জ্ঞানে মা গঙ্গা বা ভাগীরথী বলত গড়ে যার প্রস্থ ছিল প্রায় দেড় মাইল। পত্তনকালে এই শহর গড়ে ওঠে গঙ্গার ধার ধরে চিতপুর থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার মাইল জায়গা নিয়ে। জমির স্বাভাবিক ঢাল ছিল পশ্চিম থেকে পূবে লবণ হ্রদের দিকে। ফলে পরবর্তী সময়ে W. C. Clarke কোলকাতার খোলা অথবা মাটির তলার নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির সময় স্বাভাবিক ঢালের কথা খেয়াল রেখেই করে ছিলেন।

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ মূলত ব্যবসায়িক কারণে এখানে বসত্ শুরু করে। ফলে যত্রতত্র বাড়ি ঘরদোরের সঙ্গে ডোবা- পুকুর ইত্যাদি কাটা হতে থাকে। গড়ে ওঠা এই জনপদে না ছিল কোন পরিকল্পিত পানীয় জল সরবরাহের পরিষেবা বা নিকাশি ব্যবস্থা, না ছিল যাতায়াত আর মালপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত কোন রাস্তা। এ সময় নতুন গড়ে ওঠা এই জনপদে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনযাত্রা কেমন ছিল অনুমান করা সহজ। এর ফলে সে সময় একটা কলেরা মহামারীতে কয়েকশ মানুষ প্রাণ হারান যার মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় মানুষ যারা ব্যবসা বানিজ্যের কারণে এই অঞ্চলে ডেরা বেঁধে ছিল। ইংরেজ, ওলন্দাজ, ইত্যাদি ইউরোপীয়রা ছাড়াও পূবে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমের বদ্যিনাথ ধামের সব রকম মানুষও দলে দলে এখানে ডেরা বাঁধতে শুরু করেন। ব্যবসা বানিজ্য বা যাতায়াত মূলত নদী মাত্রিক হওয়ায় গঙ্গা নদীর ধার ঘিরেই শুরু হয় শহরের পত্তন উত্তর থেকে দক্ষিণে। ক্রমশ তা পূব দিকে বিস্তার লাভ করে শিয়ালদা থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত। কোলকাতা পত্তনের কাহিনী নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসবিদ দিস্তে দিস্তে লিখেছেন কি ভাবে কয়েকটা গ্রাম ঘিরে তৈরি একটা জনপদ ক্রমশ একটা মহানগরীর রূপ পায়।

এর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসতি বাড়তে থাকায় পুর পরিষেবার প্রয়োজন হলে করপরেশান অফ ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠিত হয় কোম্পানির আমলে (যার আধুনিক নাম হল কোলকাতা মিউনিসিপাল করপরেশান)। রাস্তা তৈরির এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হল সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণ। প্রবাসী ইতিহাসবিদ সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখার্জীর Calcutta: Myths and History (সুবর্ণরেখা - ১৯৭৭) থেকে জানা যায় ১৭৮১ সাল নাগাদ রাস্তা ধরে ধরে সম্পত্তি চিহ্নিত করার জন্য জেলা, গ্রাম, মৌজা ও দাগ নম্বরের বদলে প্রতিটি রাস্তার নাম আর তার সঙ্গে হোল্ডিং নম্বর দেওয়া শুরু হয়। এই জন্য করপরেশানে তৈরি করা হল রাস্তার নামকরণ করার জন্য একটি কমিটি। হোল্ডিং নম্বর দেবার জন্য একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত অনেকটা লন্ডন শহরের অনুকরণে। পূব-পশ্চিম রাস্তার উত্তর দিকের সম্পত্তি গুলোর নম্বর শুরু হত পূব দিক থেকে বিজোড় নম্বর দিয়ে আর পশ্চিম থেকে জোড় সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত হত দক্ষিণের সম্পত্তি গুলো। আবার উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো রাস্তার বেলা পূব দিকের সম্পত্তির নম্বর বিজোড় সংখ্যা দিয়ে শুরু হত উত্তর দিক থেকে আর পশ্চিমের সম্পত্তিগুলো পেত জোড় সংখ্যা যা শুরু হত দক্ষিণ দিক থেকে। রাস্তা সোজাসুজি না গেলে এই প্রথা অবশ্য সব সময় প্রয়োগ করা সম্ভব হত না। এর ফলে নতুন গড়ে ওঠা এই শহরের সম্পত্তি চিহ্নিত হতে শুরু করল একটি নম্বর ও রাস্তার নাম ধরে। হারিয়ে গেল তাদের গ্রাম, মৌজা দাগ নম্বর দেওয়া পরিচিতি। তবে জমি বাড়ি কেনা-বেচার সময় দলিলে নতুন ঠিকানা থাকলেও সঙ্গে উল্লেখিত থাকত তাঁদের পূর্ব পরিচিতি হিসেবে গ্রাম ইত্যাদির উল্লেখ।

এর আগে পর্যন্ত এই গড়ে ওঠা জনপদে বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হত, যেমন পোস্তা, বড়বাজার, দরজিপাড়া, কুমোরটুলি, কামারপাড়া, জেলেপাড়া, ভবানীপুর, কালীঘাট, আলিপুর, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ ইত্যাদি। রাস্তার নামকরণ আর হোল্ডিং নম্বর দেওয়ার পরে প্রতিটি সম্পত্তি পেল নিজস্ব এক একটা 'ঠিকানা'। এই ঠিকানা দিয়ে সম্পত্তির মালিকের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থারও একটা আন্দাজ করা যেত। সেই কারণে স্বয়ং রবি ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত 'বাঁশি' কবিতার নায়ক হরিপদ কেরানীর ভাড়া করা বাড়ীর যে কাল্পনিক ঠিকানা দিয়েছিলেন তা ছিল একটা গলিতে যার নামাঙ্কণ করেছিলেন কিনু নামধারী একজন গোয়ালার নামে। প্রথম দিকে যে মানুষের নামে রাস্তার নামকরণ করা হত তাঁর নামের পাশে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ করা হত যা পরবর্তী সময়ে লোপ পায়। যেমন মুক্তারাম বাবু-র স্ট্রীট বা রামতনু বসু-র লেন ইত্যাদি। রবি ঠাকুর এই সময়ের মানুষ না হলে কিনু গোয়ালার গলি না লিখে হয়ত লিখতেন কিনু গোয়ালা গলি।

কোম্পানির শাসনকালে বা তার পরবর্তী সময়ে রানীর আদেশনামার পরে যখন কোলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী, বড় বড় রাস্তার নাম সাধারণ ভাবে বড়লাট বা ছোটলাটদের নামে দেওয়া হত। হেস্টিংস থেকে শুরু করে কর্নওয়ালিস, ওয়েলেসলি, মিন্টো, আমহারস্ট, ক্যানিং, হ্যারিসন, অকল্যান্ড ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকের নামে শহরের বিভিন্ন রাস্তার নামাঙ্কন করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে ইংরেজ শাসকরা কিন্তু শেক্সপিয়ার বা নিউটনের নামে কোন রাস্তার নামকরণ করেন নি।(এর থেকে সে সময়কার ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা মন্তব্য করা যেতেই পারে)। এ ছাড়া অনেক রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছিল ভিনদেশীয় পার্শি, আর্মেনিয়ান, ইহুদী মানুষদের নামে। যেমন হীরাভাই মানেকজি রুস্তমজি, দাউদ এজরা ইত্যাদি। কিছু দেশীয় ধনী মানুষদের নামে যেমন অনেক রাস্তার নামকরণ করা হয়ে ছিল তেমনি চমরু, করিমবক্স, পাঁচু খানসামা, পাঁচি ধোপানী, হর ওস্তাগর বা ছকু খানসামার মত অথবা বুদ্ধু ওস্তাগরের মত অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের নামেও বিভিন্ন গলির নামকরণ করা হত। আবার অদ্ভুত নামের কিছু রাস্তা আছে যেমন ঘুঘুডাঙ্গা রোড, ক্রুকেড লেন, গুড়িপাড়া রোড, ধুকুরিয়া বাগান লেন ইত্যাদি। সময়ের সঙ্গে এক একটি রাস্তা অনেকবার নাম পাল্টেছে। যেমন তালতলা অঞ্চলের ডক্টরস লেন যা প্রথমে ছিল Taltola Bazar-ka-Rasta, তারপর হয় হাড়িপাড়া লেন আর ১৮৮২ সালে বর্তমান নামটি পায়। তেমনি হেদুয়া অঞ্চলের ডাফ স্ট্রীটের প্রথম নাম ছিল Duff Sahab-ka-Rasta ১৮৩০ সালে যা পালটান হয়েছিল। (এর থেকে আরেকটা তথ্য উঠে আসে যে শাসক গোষ্ঠী স্থানীয় ভাষার থেকে শ্রমিক শ্রেণীর হিন্দি ভাষায় বেশী সড়গড় ছিল।)

মজার ব্যাপার হল মানুষের নাম বাদ দিয়ে পেশাগত নাম দিয়েও বেশ কিছু রাস্তার নাম রাখা হয়েছিল। যেমন, মুচিপাড়া লেন, পটুয়াটোলা লেন, খালাসিটোলা লেন, কেরানীবাগান লেন, কুমারটুলি স্ট্রীট, জেলিয়াপাড়া লেন, কামারডাঙ্গা রোড, গোয়ালাপাড়া লেন ইত্যাদি। আবার জাতিগত ভাবে উড়িয়াপাড়া লেন, ব্রাম্ভনপাড়া লেন, বেনিয়াটোলা লেন, বেনিয়াপুকুর রোড ইত্যাদি। ব্যবসাগত দিক থেকে রাস্তার নাম রাখা হয় চাউলপট্টি রোড, ছাতাওয়ালা গলি, চুনাপট্টি লেন, কসাইপাড়া লেন ইত্যাদি। এর থেকে

আন্দাজ করা যায় যে সে সময় শহরের মানুষজন জাতি, ধর্ম বা পেশাগত সম্পর্কের সূত্র ধরে এক একটি অঞ্চলে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করত। গাছ, ফুল, ফল, পুকুর, নালা, সাঁকো ইত্যাদির নামেও অনেক রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন, বকুলবাগান রোড, ঝাউতলা রোড, কেয়াতলা রোড, কাঁঠালবাগান রোড, কপিবাগান লেন, চালতাবাগান লেন, কামরাঙ্গাতলা স্ট্রীট, বাঁশতলা স্ট্রীট, ইত্যাদি। পুকুরের নামে ঝামাপুকুর লেন, পদ্মপুকুর রোড, মনোহরপুকুর রোড, আহিরীপুকুর রোড, ইত্যাদি। পুরনো নথি ঘাঁটলে দেখা যাবে ১৯০৯ সালে বাগবাজার অঞ্চলে একটা অনামি রাস্তার নাম রাখা হয় কাঁটাপুকুর বাইলেন সেই রাস্তার নাম ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বদলে করা হয় বিশ্বকোষ লেন। এই রাস্তায় ৯ নম্বর বাড়িতে নগেন্দ্রনাথ বসু সাতাশ বছরের পরিশ্রমের পর বাংলা ভাষায় কোষগ্রন্থ বা বিশ্বকোষ রচনা করেন। সেই প্রথম কোন ভারতীয় ভাষায় 'এনসাইক্লোপিডিয়া' লেখা হয়। কোন বইয়ের নামে রাস্তার নামকরণের উদাহরণ অন্য কোন শহরে আছে কিনা সন্দেহ।

এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর কালীঘাট গ্রামগুলো নিজস্ব সত্ত্বা হারাল আর কোলকাতা নামে একটা নতুন শহর মানচিত্রে নিজের জায়গা তৈরি করে নিল। খেয়াল রাখতে হবে যে সে সময় রাস্তা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হত লটারি বা র‍্যাফেল বিক্রির থেকে টাকা তুলে। অনেক রাস্তা আবার বিভিন্ন মানুষের দান থেকেও তৈরি হয়েছিল যেগুলোর নামকরণ করা হত সেই সব দাতাদের নামে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় মানিকতলা অঞ্চলের সুকিয়া স্ট্রীটের নাম যা একজন পার্শি মহিলার দান থেকে তৈরি হয়েছিল।

রাস্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং অবস্থান মোতাবেক এগুলো বাই-লেন, লেন থেকে স্ট্রীট, রোড ইত্যাদিতে শ্রেণী বিভাগ করা হল। প্রশস্ত এবং দুধারে বড়বড় গাছ লাগানো এভিনিউ তৈরি হয় অনেক পরে প্রায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর সরকারী উদ্যোগে স্থানীয় জমি অধিগ্রহণ করে। লন্ডন শহরে নাকি প্রায় বিরানব্বই রকমের রাস্তার নামকরণ করা হয় তাদের শ্রেণী-চরিত্র চিহ্নিত করার জন্যে। কলকাতায় অত রকম নাম না থাকলেও অনেক রাস্তা আছে যেগুলো চিহ্নিত হয়ে ছিল লেন, স্ট্রীট বা রোড বাদ দিয়েও প্লেস, টেরাস, পার্ক, রো, রেঞ্জ, গার্ডেন ইত্যাদি দিয়ে। কারণ স্থানীয় ভাষায় গলি শব্দটি বাদ দিলে 'রাস্তা' কথাটার অনেক প্রতিশব্দ, যেমন সড়ক, পথ ইত্যাদি থাকলেও তাতে রাস্তার শ্রেণী বা চরিত্রের কোন বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কিছু পরে Calcutta Improvement Trust (CIT) কলকাতায় পরিকল্পনা মাফিক বেশ কিছু রাস্তা, পার্ক, লেক ইত্যাদি তৈরি করতে শুরু করে। উত্তর থেকে দক্ষিণে তৈরি হয় বেশ কিছু রাস্তা আর তার দুপাশে সার দিয়ে বাসযোগ্য জমি রাখা হল দৈর্ঘ্য প্রস্থের একটা সমকৌণিক সামঞ্জস্য রেখে। এর ফলে আদি বাসিন্দাদের অনেককেই বাস্তুচ্যুত হতে হয়। এভাবে শহরে এল সেন্ট্রাল এভিনিউ, ল্যান্সডাউন রোড, রাসবিহারী এভিনিউ ও বিভিন্ন এলাকার নামাঙ্কনের আগের পর্যায়ের সিআইটি রোড। ফলে আদি কোলকাতার পাড়াগুলো তাদের চরিত্র হারাতে শুরু করল। পাড়ায় পাড়ায় পুজো-জলসা ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে যে বন্ধন গড়ে উঠেছিল তা ক্রমশ হারিয়ে যেতে লাগল। কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হারাতে লাগল তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পার্ক লেন-পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গি-ধর্মতলা, ভবানীপুর-কালীঘাট, পার্কসার্কাস-বেকবাগান ইত্যাদি অঞ্চল হারাল তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য।

যারা ধরমতলা স্ট্রীটের নাম লেনিন সরণি হওয়ার আগে এই শহরে তাদের বাল্য, কৈশোর বা যৌবন কাটিয়েছেন তাদের কাছে একটা আফসোসের কারণ হল যেমন তেমন ভাবে রাস্তার নাম বদল করা। চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রীট দিয়ে যাতায়াত করে যারা বড় হয়েছে অথবা কলেজ স্ট্রীট, বউবাজার স্ট্রীটের বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা মেরেছে, ভবানীপুর অঞ্চলে মামার বাড়িতে যার সময় কেটেছে তাদের কাছে সেসব অঞ্চলকে নতুন নামে চেনা সত্যিই কষ্টকর। আর তার সঙ্গে মুড়ি মিছরির মত রাস্তার শ্রেণী বিভাগ তুলে দিয়ে লেন, রোড, স্ট্রীট বা এভিনিউ এর মত সব রাস্তাকে সরণি-কৃত করা হল আরেকটা গর্হিত অপরাধ। ঢাকুরিয়া লেকের গা দিয়ে যে সাদার্ণ 'এভিনিউ' ছিল, এই রাস্তাকে মেঘনাদ সাহা 'সরণি' নামকরণ করতে গিয়ে রাস্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা হয়েছে। একই ভাবে বকুল বাগান রোড তার নাম ও গোত্র হারাল রাজশেখর বসু সরণি হয়ে। ঢাকুরিয়া লেকের আশে পাশের লেক রোড, লেক ভিউ রোড, লেক টেরাস, লেক প্লেস, লেক টেম্পল রোড সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার নামে সরণি রূপ ধারণ করেছে। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে বিদেশী শাসকদের নামাঙ্কিত অনেক রাস্তার নাম পাল্টে দেশীয় মনীষীদের নামে নামাঙ্কিত করা হয় রাস্তার শ্রেণী চরিত্র নষ্ট না করে। কিন্তু আশির দশক থেকে সে নিয়মের আর তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। সংস্কৃত অভিধান থেকে 'সরণি' শব্দটি চয়ন করে রাস্তার নামকরণ করে শহরের রাস্তাঘাটের চরিত্র বদলে দেওয়া একেবারেই সমীচীন হয় নি। ঠিক একই ভাবে স্কোয়ার, পার্ক বা গার্ডেনের নতুন নামকরণ করার সময় বাগ বা উদ্যান করা হল ওগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দিয়ে। স্কোয়ার-কে আরেকটি বিদেশী শব্দ 'বাগ' দিয়ে অথবা মনুমেন্ট কথাটা পাল্টে আরেকটি বিদেশী শব্দ 'মিনার' ব্যবহার করা কতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে মতভেদ যাই থাকুক ওদের ভাষাটা কি দোষ করল বোঝা মুশকিল।

'কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই প্রস্তর যুগে বা তারও আগে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন কোন হিন্দু, গ্রিক বা আরবি পণ্ডিত' সেই নিয়ে ইতিহাসবিদদের চর্চা চলতে থাকুক। অথবা সাম্প্রতিক ইতিহাসে হরপ্পা সভ্যতার সময় নগর পরিকল্পনার প্রমাণ নিয়ে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখা চলতে থাকুক। তবে সাম্প্রতিক কালে গড়ে ওঠা আমাদের এই শহর কোলকাতার রাস্তার নাম করণের জন্য অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের মধ্যে ইংরেজ জাতটার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অসুবিধে কোথায়? সিপাহী বিদ্রোহের পরে মধ্য কোলকাতার বড়লাটের খাবার জলের জন্য যে জলাশয় খনন করা হয় তার নাম ট্যাঙ্ক স্কোয়ার থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার করা হয়। সেটিকে পরবর্তী সময়ে বিনয়-বাদল-দিনেশ দের নামাঙ্কিত করার সময় ফারসি বাগ শব্দটির ব্যবহার কি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল? এটির ইংরাজি বানানে BAG লেখা হচ্ছে সরকারী দলিল থেকে বাস-মিনিবাসের গায়ে। আর স্থানাভাবে তিন বিপ্লবী এখন বোধহয় আধুনিক কোলকাতার বাসিন্দাদের রুচি দেখে নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে তাঁদের নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে 'বিবাদী' রূপ পেয়েছে। আধুনিক প্রজন্ম যদি প্রশ্ন রাখে সামান্য কোন BAG নিয়ে কে বিবাদ করেছিল তার উত্তরে লজ্জায় মুখ লুকোনো ছাড়া কোন উপায় আছে কিনা জানি না। ■

১৫ই জুলাই, ২০১৯

গ্রন্থঋণঃ

Calcutta Old and New H.E.A. Cotton

কলিকাতা স্ট্রীট ডাইরেক্টরী ১৯১৫ পি এম বাগচি

Calcutta Myths and History Dr Soumyendra Nath Mukherjee

এমন তরণী বাওয়া

- শঙ্কর বসু

ছোটবেলার অনেকটা জুড়ে ছিল বিনুদি। দামোদরের গা ঘেঁষে আমাদের এলানো জনপদ। বিনুদি সারাদিন ব্যাস্ত- গরু মাঠে নিয়ে যাওয়া, ঘুঁটে বেচা, ঘরে চাল ফোটানো, সবই দ্রুত হাতে সামলায়। ওর ছোটভাই দুলু আমার বন্ধু। ওদের বাপ-মা নেই। কোনদিন ছিল কিনা দুলু জানেনা, বড়রা জানে। বিনুদিই ওর সব। নদীর ধারে মাটির ঘর ওদের। সেবার বান এসেছিল, সেই ঘর ভেসে গেল। ওরা ইস্কুলবাড়িতে গিয়ে উঠেছিল । বানের জল নামতে বিপিনমাস্টার কিছু টাকা দিয়ে ওদের ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। বিপিনবাবু দুলুকে ভালবাসতেন, ওর অঙ্কের মাথা ছিল পাকা। ইস্কুলের পরীক্ষায় আমি বরাবর ফার্স্ট হলেও অঙ্কে দুলুকে হারাতে পারিনি কোনোদিন । তবে দুলুর সঙ্গে আমার ভাব ছিল বেশ। ও আমাদের বাড়ি আসতে চাইতো- মায়ের হাতের নারকেল নাড়ু আর চালভাজা ভারী পছন্দ ছিল ওর। বিনুদি লজ্জা পেত, দুলু আসা কমিয়ে দিয়েছিল। বিনুদি সুন্দরী ছিলনা, কিন্তু কেমন গভীর ছিল, আমাদের গ্রামের শেষে যে তালদিঘি, সেরকম গভীর । বিনুদির বিয়ে হবেনা? মা বলত- তাহলে দুলুকে কে দেখবে? আমিও যেন বুঝে গিয়েছিলাম বিনুদির কিছু হবার নেই। অনেকেরইত কিছু হয়না, তবে বিনুদির ভালো হলে বেশ হত।

দুলু ভাল রেসাল্ট করে এঞ্জিনীয়ার হল- ভাল চাকরীর ডাক এক কথায় লুফে নিল। ওদের টালির ঘর থেকে দুলু যখন বিনুদির সঙ্গে প্রবাসের পথে, আমি তখন শহরের হস্টেলে – আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের অধিকার নিয়ে ব্যাস্ত। চিঠি মারফৎ জানলাম, সে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত । দুলুর বিয়ের খবরটাও ফোনএ জানলাম। চকিতে চমক ভাঙ্গে আমার, ছেলেবেলার ছায়াসঙ্গী দুলু। ছুট লাগালাম রাঁচির পথে, দুলুর শিল্পনগরীতে । দুলুর স্ত্রী সুরমা ভারি মিশুকে, নিমেষেই আপন করে নেয়। বিনুদির টালির ঘর থেকে আজ এই তিন কামরার সুসজ্জিত কোয়ার্টার । খালি হেসে বলে এসেছিস বলে খুব ভাল লাগছে । আমার কথা অস্ফুট থাকতেই ওর চোখ ভেসে যায়।

বছর খানেক গড়িয়ে চিঠি পাই দুলুর- বিনুদির বিয়ে, দুলুরই উদ্যোগে। পাত্র স্থানীয় ডাক্তার- বিপত্নীক । একটু বাধবাধ লাগলেও দুলুকে জানালাম না । একটু সংশয়ও হোল – দুলুদের সংসারে কি মানিয়ে নিতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। ব্যাস্ত আছি বলে কাটিয়ে দিলাম, যদিও এমন কিছু কাজ ছিলনা। হয়ত নতুন জীবনের জাঁকে পুরনো মুখগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায় । স্বভাবতই দুলুর সঙ্গে সম্পর্কটা ক্ষীণ হয়ে এলো, চিঠিপত্র অনিয়মিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি নিয়ে আমিও দেশান্তরী ।

তিরিশটা বছর চলে গেছে । পৃথিবী পালটে দেবার স্বপ্ন আমার এখন অস্তমিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের মূলমন্ত্র – অন্যদের মত আমিও আপোষই করেছি। লন্ডনের কাছে একটা কনফারেন্সে এসেছি, দিন সাতেকের জন্যে । আগেও একবার এদিকে এসেছিলাম, তখন পয়সার অভাবে খুব একটা এদিকওদিক যাইনি । এবার সময় ও পয়সা দুটোই কিছুটা বাহুল্য । ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটা বইয়ের দোকানে উঁকিঝুঁকি মারছি, এমন সময়ে কাঁধে হাল্কা একটা ছোঁয়া। কেমন আছিস? বিনুদিকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না, এখানে, এভাবে?? তিরিশটা বছর তালদিঘির জলে অনেক ঢেউ উঠেছে, এক ঝলকেই বোঝা যায়, কিন্তু জল এখনো টলটলে, সুগভীর । আমার অপ্রতিভ চেহারা বোধহয় বিনুদির চোখ এড়াল না । অল্প কিছু কথা হল। বিনুদির পুত্র ডাক্তার, এখানেই কর্মরত, বাবার অবর্তমানে মাকে নিয়েই সংসার । একটা ভালোলাগার অনুভুতি মনকে ছুঁয়ে গেল, আসব একদিন বলে কথা দিলাম। দুদিন পর ঠিকানা খুঁজে বিনুদির বাসায় পোঁছোতে বিশেষ অসুবিধে হলনা। অ্যাপার্টমেন্টটা ছবির মত সুন্দর, সাজানো- সামনে একফালি লন আর ফুলের বাগান। পারিপাট্যের গুণে ভারী কমনীয় পরিবেশ – বিনুদির ফেলে আসা মাঠ, নদী আর গাছগাছালি এখানে সুন্দর জায়গা করে নিয়েছে। বাগানে বসে ভারি একটা আড্ডা হল, বিনুদির হাতে গড়া নিমকি, মিষ্টি খানিকটা বেশিই হয়ে গেল । উঠবো উঠবো করছি, এমন সময়ে ভাগ্নের প্রবেশ, শ্রীমান সুমিত- ভারি সপ্রতিভ হয়ে প্রণাম করলো এসে । আশীর্বাদ করতে মুখের দিকে তাকাতেই একটু থমকে গেলাম। বিনুদির মুখের দিকে চেয়ে আর বলা হলনা । সুমিত আধঘণ্টা কাটিয়ে ঘড়ি দেখতে লাগলো, বুঝলাম ব্যাস্ত মানুষ সে। আরও একদিন আসতে হবে মামু, কথা নিয়ে সে হাসপাতালে ছুটল । আমার আত্মস্থ হতে একটু সময় লাগলো । মিনিট খানেক চুপচাপ। বিনুদিই প্রথম কথা বলল । জানি সুনীল, তুই ঠিকই বুঝছিস, সুরমার মুখ ওর শরীরে বসানো । আমি বেশ অপ্রস্তুত । দুলুদের বিয়েটা বেশিদিন টিকলোনা রে, সুমির যখন দুবছর সুরমা আর দুলুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল । একরত্তি ওই ছেলেকে নিয়ে সেকি টানাটানি । সুরমার প্রেমিক বাচ্ছার দায়িত্ব নেবার ছেলে নয়, আর দুলুও কেমন একরোখা জেদি বাপ, সেকি দিন গেছে। আমার কর্তা উপায় বাতলালেন, ওকে আমরাই মানুষ করলাম । ও বোধহয় মানুষই থাকবে, অন্তত আমরা সেভাবেই ওকে বড় করেছি । তবে ভয় হয়, বিয়ের বয়েস হোল ... বিনুদি কেমন আনমনা হয়ে যায়।

বিনুদির চোখে শিশিরবিন্দুর চিকচিক, সন্ধের নিস্তব্ধতায় শ্বাসের ওঠানামার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তিরিশ বছর ধরে নদীর স্রোতে ভেসে এখনও কিনারার দেখা মেলেনা... শুধু দাঁড়ের ছপছপ।

তিনদিন পর লন্ডন ছাড়লাম । নতুন কোন বিস্ময় নেওয়ার ধৈর্য আর নেই। ■

সফর

- শুচিতা দাসগুপ্ত

সাধ করে বেড়ানো প্রায় অনেকদিনই হয়ে ওঠে না। কিন্তু, সেবার আমরা বেড়াতে বদ্ধপরিকর। ফলে, মাসদুয়েকের মধ্যে সবরকম প্রস্তুতি সেরে এক জুলাইয়ের শেষে গাঁঠরি বেঁধে বেড়িয়ে পড়লাম। প্রথম গন্তব্য রোম তারপরে ফ্লোরেন্স। আমাদের উড়ান ছিল হিরোশিমা থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে রোম।

রাতভর আরামের ঘুমের পরে রোমের মাটিতে পা দিলাম, বাইরে তখন মন ভাল করে দেওয়া ঝকঝকে সকাল। এয়ারপোর্ট থেকেই চলে আসা হল সংলগ্ন রেলস্টেশনে, যেতে হবে রোমশহরের একেবারে কেন্দ্রে, নির্ধারিত হোটেলে। শহরের বেশ জমজমাট জায়গায় আমাদের হোটেল। চারিদিকের হাবেভাবে পুরোনো আর হাল আমলের আমেজ। চেক-ইনের সময় বিকেল হলেও জিনিসপত্র রাখা এবং স্নানাদি সেরে নিতে অসুবিধে হল না। এখন যাব ভ্যাটিকান সিটি। হোটেল থেকে বেরিয়েই সামনের চারমাথার মোড়ে এক বড় গোল চত্বরে সেদিন বিরাট জনসভা, সেই ভিড় ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম চওড়া সরু নানা ধরনের পাথুরে রাস্তা ধরে। ঘড়িতে মাত্র বেলা এগারটা, অথচ শহর তেতে উঠছে। মিনিট কুড়ি পরে যখন ভ্যাটিক্যান সিটির সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন আর তর সইছে না-- চুম্বকের আকর্ষণে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের মিউজিয়াম যেন টানছে আমাদের! ঝাড়া তিনঘন্টা আমরা বিভোর হয়ে রইলাম মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, বত্তিচেল্লি, পেরুজিনোর জগতে। সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদের সেই বিখ্যাত "Birth of Adam" আর "Birth of Eve" ছবি দেখে বহুবছরের মনের লালিত সাধ মেটালাম আর মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসকে, যিনি তাঁর নিজস্ব শিল্পসংগ্রহ দিয়ে এই মিউজিয়ামের সূচনা করেন। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এবার ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকি, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা, টাইবার নদীর ধারের ক্যাসেল সেন্ট অ্যাঞ্জেলো, স্প্যানিস স্টেপস-- ক্লান্তিহীন ভাবে। ততক্ষণে বেলা বেড়েছে, ত্রিভি ফোয়ারার কাছে ভীড় জমতে শুরু করেছে। জেলাত্তোর স্বাদ নিতে নিতে আমরাও দাঁড়াই ত্রিভির সামনে। পরেরদিন সকাল সকাল হাজির হলাম প্যানথিয়নে। পুরোনো রোমান এই মন্দির পরে "সান্টা মারিয়া রোটোন্দা" গির্জা হিসেবেই পরিচিত। আশ্চর্য গড়নের জন্য এই স্থাপত্য রোমের অন্যতম আকর্ষণ। গির্জার ভিতরেও আছে নানা সুন্দর দেওয়ালচিত্র আর ভাস্কর্য। এরপর পিয়াজা নাভোনায় কিছুক্ষণের অলস বিচরণের পরে রওনা হওয়া গেল সেরা আকর্ষণ কলোসিয়ামের পথে। এর ভিতরে চলতে চলতে কেবলই মনে উকি দেয় গ্ল্যাডিয়েটরদের কাহিনি। লম্বা সময়ের শেষে কলোসিয়াম ছেড়ে এগিয়ে যাই বিস্তীর্ণ রোমান ফোরাম আর প্যালেটাইন হিলস অঞ্চলে। মনও হারিয়ে যায় বিগত শতকগুলোর অলিগলিতে। বেলা পড়ে আসে-- ফোরামের চত্বর ছেড়ে ফেরার পালা। চমৎকার কিছু স্যুভেনির কিনে নিলাম, ফেরার সময়। রাতের খাওয়া সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই। কন্যে ব্যস্ত তার প্রয়োজনীয় ফোটোগ্রাফ আর নোটস গুছিয়ে নিতে। কারণ, এই বেড়ানোর অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে ইউরোপীয় রেনেসাঁস পর্বের শিল্পকীর্তির বিষয়ে তার স্কুলের জন্য ছোট্ট একটা প্রজেক্ট করতে চায়। পরদিন আলো ফোটার আগেই রওনা দিলাম ফ্লোরেন্সের পথে এবং বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ফ্লোরেন্স।

এখানে 'পিয়াজা ডুওমো'র (Piazza Duomo) চত্বর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে আমাদের হোটেল। জিনিষপত্র রেখে একটু বেলার দিকেই হাজির হলাম ডুওমো চত্বরে। এবার মুগ্ধ করে শিল্পী গিওত্তোর কাজ। বিখ্যাত Santa Croce গির্জা দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। এরপর যাত্রা দান্তে মিউজিয়ামে। "Inferno" পাঠরতা কন্যের সবথেকে প্রাচীন পান্ডুলিপিটি দেখা চাই। এই মিউজিয়াম দেখা যেন এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। পরের সকাল শুরু হয় উফিজি প্রাসাদ ও মিউজিয়ামের অতুলনীয় শিল্পকলার স্পর্শ দিয়ে, সঙ্গে থাকে Logia dei Lanzi র স্থাপত্যসম্ভার। আয়েস করে দেখি উফিজি চত্বরের সমস্ত দ্রষ্টব্য। মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে এত শিল্পকীর্তির অবস্থান!!! বিস্মিত না হয়ে পারি কি? মধ্যাহ্নভোজের পরে চলে যাই অ্যাকাডেমিয়া গ্যালারিতে। বিশ্বখ্যাত ডেভিডের মূর্তি আরও অসংখ্য শিল্পকীর্তির সমারোহ এখানে। দিনশেষে মধ্যযুগীয় সেতু Ponte Vechhio র ওপারে সূর্যাস্ত হয়। মনে করে সংগ্রহ করি সুদৃশ মুরানো গ্লাসের স্যুভেনির আর নৈশভোজ সারি স্থানীয় তাসকানী খাবার দিয়ে। রাত পোহালেই এবার বেরিয়ে পড়ব প্যারিসের দিকে-- সে এক নতুন সফর। ■

গলি

- বেবী বসু গুপ্ত

গলির মোড়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ও। গলির মুখে একটা বকুল ফুলের গাছ। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরের নিদাঘীবেলায় পথচারীকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতেই হয়। ভূমিতে ছোট্ট ছোট্ট ফুলগুলি নজরে না এলেও এ ফুলের তিক্তমধুর সুবাস সমস্ত স্থানটিকে মদির করে রাখে। এখন বসন্তকাল, ফুল ফোটেনি, তবে বৈশাখ সমাগত, কুঁড়িদের বোধহয় স্বপ্ন দেখা শুরু হোয়ে গিয়েছে। মানুষ তো দিনে রাতে কত স্বপ্নই দ্যাখে। স্বপ্ন-ভঙ্গ হবার কথা কেই বা মনে রাখে! ও'ই বা মনে রাখতে যাবে কেন?

বেলা তখনও পড়ে আসেনি। শেষ বসন্তের রোদের ঝাঁঝ বৈশাখের ইঙ্গিতবাহী। খুব বেশিদিন হয়নি যখন এ গলি পথ ধরে সোজা উপনগরীর প্রধান সড়ক ছেড়ে ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে প্রায় প্রত্যেক দিন নদীর ধারে পৌঁছে যেত। জলের ঢেউ ওদের মনেও ভাবনার তরঙ্গ তুলে জোয়ার ভাটায় মিশে যেত। পড়াশুনোর পর্ব মিটলে কত ভবিষ্যতের চিন্তা ওদের মুখর করে রাখতো। কথা যেন শেষ হোত না অভিষেকের, নীরব শ্রোতা ছিল ও। কখনও হেমন্তের হিম, কখনও শীত শেষের নৈঃশব্দ ওদের মনের কথা বুঝতে সাহায্য করতো।

এই সেই গলির শেষ প্রান্ত। ও প্রান্তে নদীর পাড়, মাঝে হেঁটে চলে গেছে ওরা কত দিন, কত সন্ধ্যা, কত বেলা-বাড়ার বকুল-ঝরা পথে। অচেনা থেকে চেনা হোল মন, চেনা পথ হোল অচেনা। চেনা-অচেনার যুগলবন্দী। নাতিদীর্ঘ পথে যবনিকা পতন। কেন মনে আসেনা এ তো শেষ নয়, সবে শুরু। গলির মোড়ে আচমকা থমকে দাঁড়াতেই কে যেন তাড়া দিয়ে বলে,

---"কী হলো আবার? চলো, দেরী হোয়ে যাবে। এখনও সময় হয়নি, পরে আসা যাবে অন্য কোনও দিন"।

---"কবে আসবে বলতে পারো? রোজই তো কাজের তাড়ায় থাকি দুজনেই"।

---"যেদিন তুমি আমায় ভুল চিনেছিলে বলে মনে হবে"!

---"কেবল বাজে কথা বলে তুমি আমায় ভোলাতে চাও"। মৃদু অনুযোগ।

---"ঠিক বলেছো। গত বছর কয়েক ধরে তোমার কি মনে হয়নি আমার সঙ্গে তোমার অনেক অমিল? আমি তোমায় কেবলই ভুলিয়ে নিয়ে চলেছি অন্য পথে"?

---"কী বলি বলো তো! তুমি বোধহয় সব বুঝে বসে আছো"।

গলির মুখে একটা দমকা হাওয়ায় ওর খোলাচুল উড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। কার কথা ভাবতে ভাবতে কিসের কথা মনে পড়ছিল।

---"আবার দাঁড়ালে কেন? কী হলো তোমার আজ? মাটির দিকে চেয়ে কী খুঁজছো"?

---"বকুল ফুলের গন্ধ পাচ্ছো না? ফুল নেই কেন তবে"?

---"বৈশাখ আসুক, তবে তো তোমার চেনা গন্ধ সেই মদির করা বকুল ফুল কুড়োনো গলির এপার থেকে চলে যাবে আকাশ বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনেক দূরের দেশে মরু বালুকণার সমুদ্র সৈকতে"।

গলির মোড়ে বকুল গাছের ছায়া গাঢ় হয়, ছায়া আর রোদে লুকোচুরি খেলা চলে। কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কে কথা বলে যায়! বাতাস তপ্ত, হাওয়ারা ঘুরে ফিরে চলে যায়।

---"আবার কী হলো? কী চাও বলবে তো মন খুলে"।

---"কী বলবো তাই ভেবে ভেবে তো দিন রাত একাকার। তুমি বলেছিলে এইখানে এই গাছের ছায়ায় সারাজীবন দাঁড়িয়ে তোমার সময় কেটে যাবে"।

---"বলেছিলাম, তোমায় পাবো বলে"।

---"আমাকে চিনতে চেয়েছিলে কী না বলো"!

---"বলা বড় কঠিন। তুমি ছেয়ে আছো আকাশের গায়ে, বকুল সুগন্ধে ঘেরা এই সংকীর্ণ গলিপথে। তোমায় কী পাওয়া যায় স্বপ্নহারা কোনও চেনা সুখে অচেনা সাধের আঙিনায়"?

রিং রিং মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। ওপাশ থেকে অভিষেকের কণ্ঠস্বর,

---"পেপারস্ সব পেয়েছো তো? ফরম্যালিটিগুলো সেরে ফেলো, স্পাউজ ভিসা পেয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তাহোলে সামনের মাসের প্রথমেই পৌঁছে যাবে আমার কাছে"।

---"সামনের মাস মানে বৈশাখের প্রথমেই"!

---"হঠাৎ বাংলা মাসের হিসেবে চলছে কেন সফট্অয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের নবপরিণীতা বৌ"?

ও ফিস্ ফিস্ করে বলে,

---"বকুল ফুল ফোটার আগেই"!

---"কী বলছো শুনতে পাচ্ছি না। এমিরেটসের ই-টিকিট বুক করে দিয়েছি, মেসেজ পেয়েছো তো"?

---"হুঁ"।

---"প্রিন্ট আউট বের করে নিও, লক্ষ্মীটি। তোমাকে ছাড়া কোথাও বেড়াতে যাইনি এখনও। তেলের টাকার শহরের চটক তোমার কেমন লাগবে জানি না। তুমি এলে আমি স্বস্তি পাবো। বাইরের খাবার খেতে আর ভাল লাগছে না"।

---"আমাদের গলির মোড়ের বকুল গাছের ফুল ফোটার সময়ে আমি থাকবো না এখানে"!

---"লাইনটা ডিস্টার্ব করছে, কিছু শুনতে পাচ্ছি না। পরে কথা হবে কেমন? এখন অফিসে রয়েছি। আমি ভাল আছি, তুমি ভেবো না। আর ক'দিন বাদেই তো উড়ে এসে আমায় জুড়ে বসবে। ভাল থেকো"।

এতক্ষণ গলির মোড়ে বকুল গাছের তলায় কার সঙ্গে কথা বলছিল ও? আর এইমাত্র মোবাইলে তো অভিষেক কথা বললো দুবাই থেকে।

গলির মোড়, বকুল গাছের ছায়ায় অভিষেক প্রথম যাকে চিনেছিল, তার নাম অন্বেষা, যে শুধু ফুলের মতো একা কথা বলে। ■

This story has been reproduced as a stand-alone article for independent publication. The story appeared in the self-published book 'চেনা সুখ, অচেনা বেদনা' (Chena Sukh Ochena Bedona) by the same author.

শতবর্ষে রবীন্দ্র সরোবর

- মিত্রা মুখার্জি

কলকাতা বাসীদের কাছে রবীন্দ্র সরোবর এক বহু শ্রুত একটি জনপ্রিয় জায়গা। ওখানে সকাল বিকেল আশপাশের কলকাতা বাসীরা প্রাণ খুলে হাসেন, বিশুদ্ধ হাওয়া সেবন করেন, সাঁতার কেটে বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে শরীরের কলকব্জা গুলো ঠিক রাখেন।

আমি দক্ষিণ কলকাতায় থাকি। পিতৃ গৃহ ও শ্বশুড়ালয় দুই ই গোলপার্ক ঢাকুরিয়া ঘিরে। বাড়ি র কাছে ই ঢাকুরিয়া লেক। ঢাকুরিয়া লেকের বর্তমান নাম রবীন্দ্র সরোবর। নামের সাথে সাযুজ্য রেখেই অধুনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পূর্ণাবয়ব মুর্তি রাখা হয়েছে। একসময়ে টালিগঞ্জ থেকে সাদার্ন এভিনিউ বা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যাবার একমাত্র সর্টকাট রাস্তা ছিল লেকের মধ্য দিয়েই। লেক তখন পথচারী ও গাড়ী চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

আমি এই লেকের উজ্জ্বল সূর্যালোকিত সকাল যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি পূর্ণিমা রাতে লেকের মোহময়ী রূপ। আবার উম্পুনের সময় তার অদেখা উত্তাল রূপ TV তে দেখলাম।

আমার জন্মের অনেক পূর্ব থেকেই এই লেক টি কলকাতা শহরের ফুসফুস হিসেবে রয়েছে।১৯২০ সালে এটি খনন করা হয় ।১৯২ একর জমির ওপর দুটি ছোট ও বড় দ্বীপ , পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রাচীন মসজিদ, তিনটি কামান, অনেক গুলো ক্লাব ও সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়ে সরোবর টি স্ব মহিমায় কলকাতা কে তিলোত্তমা করেছে।

ঢাকুরিয়া থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রিজের মাঝখানে র সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ডানদিকে বেঙ্গল মিউজিক কলেজের পাশে দিয়ে লেকমুখী হাঁটা পথে চললে এখন প্রথমে দেখা যায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সদ্য প্রয়াত শ্রী প্রণব মুখার্জি র কলকাতার বাসস্থান। তারপরে কলকাতার একমাত্র জাপানি বুদ্ধ মন্দির।

জাপানি বুদ্ধ মন্দির---একটু বড় হবার পর জেনেছি ১৯৩৫ সালে মন্দির টি জনৈক নিচিদাতসু ফুসি, ওনার গুরুর আদেশে বুদ্ধের বাণী প্রচার ও সঙরক্ষনের জন্য তৈরি করেন। মন্দির নির্মাণের জন্য জমি টি দান করেন যুগল কিশোর বিড়লা। আমরা বিকেল বেলায় লেক বেড়িয়ে ফেরার সময় কোন কোন দিন সেখানে একটু প্রার্থনায় বসতাম ও নকুল দানা প্রসাদ নিয়ে ফিরতাম। এখানে সকাল-সন্ধ্যা বিশাল এক ড্রাম বাজিয়ে প্রার্থনা হয়। শ্বেত পাথরের বুদ্ধ মূর্তি টি খুব সুন্দর।

বুদ্ধ মন্দির থেকে ৫ মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় লেকের একদম দক্ষিণে। ওখানে ডানদিকে বিশাল একটি public swimming pool আজ ও আছে। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল একদার শিশু উদ্যান। ওখানে দোলনা চড়তে যেতাম। Children's Park এর কাছেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে র সময়ের একটি military barrack হাসপাতাল। পার্কে একটা ফোয়ারা ছিল।জল প্রায় থাকতে না। এই পথে চলতে চলতে জেনেছি কত গাছ গাছালির নাম। যেমন পিটালি,পাকুড়,হিজল,করন্জ, Spanish Mahogany, জংলী বাদাম আরো কত অজানা নাম।খবরের কাগজে পড়লাম উম্পুনের তান্ডবে সেখানে একটি ১০০ বছরের পুরোনো গাছ পড়ে গিয়েছে।

লেকের মধ্যে যে বড় সবুজ দ্বীপ টি আছে সেখানে পানকৌড়ি আর পরিযায়ী পাখিদের ভীড় দেখা যায়। এই লেকেই দেখেছি rowing competition. লম্বা বড় নৌকো , ছয় / চার জনে দাঁড় বাইতেন ও একজন guide করতেন। সেগুলো আজ ও দেখা যায়। সেই সময় বাইচ খেলার দিন একজন বিদেশি ভদ্রলোক সাইকেলে চড়ে মুখে চোঙা মাইক নিয়ে competetors দের navigate করতে সাহায্য করতেন। আমরা উৎসাহ নিয়ে দেখতাম। Calcutta Rowing Club তো এই লেকেই National Rowing Championships আয়োজন করে। আমরা এগিয়ে চলতাম Hanging Bridge এর পথে। ওখানে একবার যেতেই হোতো। তখন লেক গার্ডেন্স গড়ে ওঠেনি।

ঝুলন্ত ব্রিজ---এই ব্রিজটিকে Hanging Bridge নামেই জানতাম। আগে এটি কাঠের তৈরি ছিল পরে মার্টিন বার্ন কোম্পানি লোহার পোক্ত ব্রিজ বানিয়ে দেয়। আমরা অনেকবার ঐ ব্রিজে উঠেছি।এটি দোলে। রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। নীচের দিকে তাকালে বিশাল সব মাছ দেখা যায়। এখন বাঙলা TV serial এর পরিচিত outdoor shooting location. এক সময়ে কাছেই একটি Lily Pool ছিল। একটা সাজানো বাগানের মাঝে ছিল ছোট জলাশয়।তার ওপর একটা ছোট সাঁকো। আমি পান্থপাদপ ও ফনীমনশা গাছ প্রথম এখানে দেখি। কেয়া গাছ ও ছিল। লেকে কেয়া গাছের গুচ্ছ বিক্রি হতো।

লেক মসজিদ---- অনেকেই হয়তো জানেন না বা দেখেন নি লেকের পশ্চিম প্রান্তে ই একটি ছোট দ্বীপের ওপর এক পুরোনো মসজিদ আছে। ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। ছোট বেলায় কখনো যাইনি ওখানে। কয়েক বছর আগে এই মসজিদটি দেখতে গিয়েছিলাম। মহিলাদের ভেতরে যাবার কিছু বিধিনিষেধ আছে। যেটুকু জানতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে এটি একটি private mosque.১৮২৪ থেকে ১৮২৫ এর কোন সময়ে তৈরি হয়।জনৈক সৈফুদ্দিন আহমেদ এখন এই মসজিদটি র দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন। ওনার পূর্ব পুরুষ জনৈক শেখ জালাল উদ্দিন আহমেদ এটির প্রতিষ্ঠাতা।অল্প কিছু স্থানীয় লোকেরা এখানে নামাজ পাঠ করেন।পশ্চিম দেয়ালে একটি বড় মক্কামুখী Mihrab আছে । রমজান মাসে যথেষ্ঠ ভীড় হয়। Rowing club এর বাড়ীটি একসময়ে ঐ পরিবারের বাসস্থান ছিল।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে পশ্চিম থেকে দক্ষিণে বজবজ রেল লাইনের পাশ দিয়ে ফেরার পথে আজ ও দেখা যায় সেই তিনটি কামান। দুটি বড় ও একটি ছোট।

কথিত আছে এগুলো নবাব সিরাজউদ্দৌলা র আমলের।লেকটি খনন করার সময় পাওয়া যায়। মনে করা হয় ১৭৫৬-৫৭ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা পুনরায় উদ্ধার করলে ,সিরাজদৌল্লার সৈন্যরা এগুলো ফেলে যায়। আমি এদের বিস্তারিত ইতিহাস জানিনা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যেতাম Anderson Club- এ।

অধুনা এটি Indian Life Saving Society নামে পরিচিত।এই ক্লাবটি ভারতে অনেক নামকরা সাঁতারু দের উপহার দিয়েছে। এখনও এখানে সাঁতার প্রশিক্ষণ ছাড়াও অনেক সমাজ সেবা মূলক কাজ হয়। একজন সভ্য হিসেবে আমি এদের নানান cultural function দেখতে যাই। তাছাড়া খাওয়া দাওয়ার উৎসব তো লেগেই থাকে।

একসময় এই ক্লাব জল- নাটিকা ' অর্থাৎ Water Ballet দেখিয়ে খুব নাম করেছিল।

যেটা না বললেই নয় তা হচ্ছে বিকেলে লেকের মুখোরোচক খাবারের কথা। মনে পড়তেই ছুটে চলে গেলাম আমার ফেলে আসা ছোটবেলায়।

মনে পড়ছে শিশু উদ্যানের উল্টো দিকে ছিল বিলাসের বিখ্যাত ফুচকা,গরম চিনে বাদাম শুকনো ধনেপাতা বাটা নুন সাথে,ঝালমুড়ি,ঘটিগরম,(এক গুজরাটি বিক্রেতা সাদা কুর্তা পাজামা ও টুপি পরে বিক্রি করতেন। কুলফি(ভাঁড়ের ও পাওয়া যেত) এবংআইসক্রীম তো ছিলই। কিছু না কিছু অনেক সময় খেয়েছি।

বর্তমানে কিছু নতুন সংযোজন হয়েছে। Children's park এর জায়গায় Safari park, নজরুল মঞ্চ, পদ্ম লেক , নতুন সাঁতার ক্লাব ,টাইলস্ বাঁধানো চলার পথ আরো কত কিছু।এতো হতে থাকবেই।

তবে ইদানিং কালে ছট্ পূজো উপলক্ষে লেকের জলকে যে ভাবে ব্যবহার করা হল তা অত্যন্ত নিন্দা জনক ও চিন্তার কারন।।২০১৯ সালে পরিবেশ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে , সরোবরের গেটের তালা ভেঙে কার্যত সরকারি আদেশ অমান্য করে লেকের জল ও পরিবেশ দূষিত করা হয়েছে। আশাকরি ভবিষ্যতে এরকম আর দেখতে হবে না।

এখন আর লেকে নিয়মিত বেড়াতে যাবার খুব উৎসাহ বোধ করি না। যা দেখা আছে তাই "ভরা থাক স্মৃতি সুধায়।" ।এই লেখার উৎসাহে ঢাকুরিয়া লেক কে ঘিরে আমার ছোট বেলার কিছু স্মৃতি রোমন্থন হলো। দক্ষিণ কলকাতা বেড়াতে এলে অবশ্যই রবীন্দ্র সরোবরে বেড়াতে যাবেন। ছবি তুলবেন,প্রাণ ভরে অক্সিজেন নেবেন,brisk walking করবেন আর সুন্দর স্মৃতিগুলো মনের মনিকোঠায় রেখে দেবেন। ■

সোনালি স্মৃতি

- শমিত রায়

সময়টা ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে। আমরা সল্টলেকে এসেছি কিছু মাস হবে, চাকরি করছি এক সিএ ফার্মে। দিনটা শনিবার, স্পষ্ট মনে আছে কারণ আমার ছুটি ছিল। আমার স্কুলের বন্ধু মণ্টু হঠাৎ বাড়ি এসে হাজির। বললো ও সল্টলেকে একটা অডিট এসাইনমেন্টে এসেছে। এ ব্যাপারে বলে রাখি যে বছর খানেক হলো মন্টু সিএজি অফিসে অডিটর হিসাবে চাকরি পেয়েছে। তা কোন অফিসে অডিট করতে যাবি, জিজ্ঞাসা করতে বললো কোম্পানির নাম ওয়েবেল সেন কাপাসিটার্স লিমিটেড (ওয়েবেল), ঠিকানা ব্লক বি এন, সেক্টর ফাইভে । পরে জেনেছিলাম এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সেনর্যালে গোষ্ঠীর একটি যৌথ উদ্যোগ। তা ঠিকানা চিনতে অসুবিধা হবে বলে মন্টু আমায় অনুরোধ করলো ওর সঙ্গে যদি আমি যাই ঐ কোম্পানিতে কারণ ও সল্টলেক খুব একটা ভালো চেনে না।

১৯৮৫ সালে সল্টলেক চেনাই বেশ কঠিন আর সেক্টর ফাইভ হলে তো কথাই নেই। দুটো কোম্পানি, মোটে দুটো কোম্পানি তখন ছিল এই সেক্টর ফাইভে। এক ফিলিপ্স আর দুই এই ওয়েবেল। তখন গাড়ী আর কজনের ছিল । আর ট্যাক্সি সেতো সল্টলেকেই আসতে চাইত না, সেক্টর ফাইভ তো অনেক দুরের কথা । তাই যাতায়াতের উপায় করুণাময়ী অবধি এল ১৪ বি বা ৪৬এ তে গিয়ে কপাল ভালো থাকলে অটো আর নাহলে আধা ঘন্টার হাঁটা পথ । এল ১৪ সির এক গুমটি ছিল সেক্টর ফাইভে করুণাময়ী থেকে একটু এগিয়ে , কিন্তু সেখান থেকেও মিনিট দশেক হাঁটা পথ।

আমাদের কপাল ভালো ছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা এল ১৪সি বাস পেয়ে যাই, টার্মিনাসে নেমে দশ মিনিট হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম ওয়েবেল এর গেটে । চারদিকে ফাঁকা জমি, বড় বড় ঘাস, জনমানবশূন্য। দিনেরবেলা একা যেতেও ভয় করবে। গেটে এন্ট্রি করে আমরা চলে গেলাম মেন অফিসে। সেখানে দেখলাম মন্টুর এক সহকর্মী অসীম বসে আছে। আমরা গেলাম ফিনান্স ম্যানেজার সুশোভন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। মন্টু ও অসীম নিজেদের পরিচয় দিলো এবং আমায় দেখিয়ে বললো যে আমি ওদের বন্ধু, সিএ পাস এবং এক অডিট ফার্মে চাকরি করছি । অফিস চিনতে অসুবিধা হবে বলে মণ্টুর সাথে এসেছি। কথাটা শেষ হতেই সুশোভন বাবু জানালেন যে তারা একজন দু তিন বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোয়ালিফায়েড সিএ খুঁজছেন । আমি যদি জয়েন করতে চাই তাহলে উনি ব্যাপারটা দেখবেন। সুশোভন বাবু জানালেন যে উনি নিজে কস্ট একাউন্টেন্ট, মাস তিনেক হলো জয়েন করেছেন এবং এর আগে মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন চাকুরিসূত্রে । এও বললেন যে আমাকে যে পোস্টের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে সেই পোস্টে এর আগে দুজন জয়েন করেছিল কিন্তু দুজনেই বেশিদিন এই পান্ডববর্জিত দেশে কাজ করতে চায়নি । কিন্তু আমি যেহেতু সল্টলেকে থাকি, আমার সমস্যা হওয়ার কথা নয়, তাছাড়া পুল কার এর ব্যবস্থা থাকবে। মন্টু ও অসীমের সম্মতি নিলাম, আর আমার ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতা প্রয়োজন এবং এই কলকাতাতেই, এই ভেবে রাজি হলাম।

ইন্টারভিউ হলো, সিলেক্টেড হলাম । ডেসিগনেশন একাউন্টস অফিসার। যেখানে কাজ করছিলাম, সেই সিএ ফার্ম থেকে কাজ হ্যান্ডওভার করে ছাড়া পেতে প্রায় দিন কুড়ি লেগে গেলো। ১৯৮৫ সালে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়েন করলাম ওয়েবেল কোম্পানিতে। প্রথম দিকের চাকরি বলে কিনা জানিনা, আমার প্রথম প্রথম দারুন লাগল কোম্পানি, তার লোকজন এবং পরিবেশ। তাছাড়া বাড়ির খুব কাছে বলে আমার বাড়তি সুবিধা। অফিসের সময় ছিল সকাল ৮.৩০ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। একান্ত কোন বিশেষ কাজ না থাকলে অফিস ছুটির পর থাকার প্রয়োজন ছিল না । কোম্পানির পুল কার এর ব্যবস্থা ছিল, তাই আমি সকালে ৮-১৫ তে বাড়ি ছাড়তাম পুল কারে আর বিকেলে ছুটির পর ৫-১৫ এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছতাম।

ওয়েবেলে প্রথমে যে জিনিসটা ভালো লেগেছিলো যে এখানে প্রাধান্যপরম্পরা বা hierarchy বলে প্রকাশ্যে কিছু ছিলোনা। বয়সে বড়ো হলে দাদা বা দিদি আর ছোট হলে নাম ধরে ডাকা তা সে যে পোস্টের হোক না কেন। যেমন সুশোভন বাবু আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, তাই আমি ওনাকে সুশোভনদা বলে ডাকবো আর উনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন । আবার আমার ডিপার্টমেন্টের বোসদা লেজার কিপার ছিলেন, কিন্তু বোসদা সুশোভনদা কে সুশোভন বলে সম্বোধন করতেন । hierarchy হীন এই প্রথা আমার খুব ভালো লেগেছিলো।

কোম্পানির কর্মী সংখ্যা প্রায় ২০০ - ৮০ জন ছেলে ও ১২০ জন মেয়ে । বেশির ভাগ ছেলে মেয়ের এটি ছিল প্রথম চাকরি। মেয়েদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ তাদের কোমল হাত টিভি পার্টস তৈরির উপযোগী বলে ম্যানেজমেন্ট এর ধারণা।

আমাদের ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আমাকে নিয়ে পাঁচজন। সুশোভনদা ও বোসদার কথা আগে বলেছি, এছাড়া ছিল কস্ট একাউন্টেন্ট গৌতমদা ও ক্যাশিয়ার কাম সব বিবিধ কাজের জন্য বিখ্যাত তাপস দাস। খুব অল্প দিনের মধ্যে আমার ও তাপসের মধ্যে এক দারুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। তাপস আমার সাথে একই বছরে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিল আর তাই দুজনে দুজনকে নাম ধরে আর তুমি বলে সম্বোধন করতাম। তাপসের বাড়ি রানিগঞ্জে এবং ও কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকতো। সপ্তাহান্তে বাড়ি যেত বলে শনিবার একটু আগে অফিস থেকে বের হতো ও সোমবারে একটু দেরিতে আসতো কিন্তু এ নিয়ে কেউ কখনো কোনো আপত্তি করেনি। কোনো শনিবারে দেরি হয়ে গেলে তাপস আমাদের বাড়িতে থেকে যেত এবং রবিবার দিন ভোরে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরতো। ভোরবেলায় আমি ওকে এস১৮ বাস ধরিয়ে দিতাম হাওড়া যাওয়ার জন্য ।

এত অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকা তাই তাদের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা হওয়াটা স্বাভাবিক। তখন স্যালারি পেমেন্ট হতো ক্যাশ টাকা খামে ভরে। অনলাইন পেমেন্ট তো নয়ই, এমনকি চেকও সিনিয়ার ম্যানেজার ছাড়া সবার ক্ষেত্রে ছিলনা। তা তাপস একদিন আমায় বললো কয়েকটি মেয়ের নাম যেমন চামেলী, শ্যামলী, শুভ্রা ইত্যাদি, মানে তাপসের চোখে যারা সুন্দরী সেই ক্রমানুযায়ী । তাপসের দুঃখ যে ও এই কিছু মেয়েদের ভালো কড়কড়ে নোট দেয় পে প্যাকেটে, কিন্তু এরা ধন্যবাদ তো দূরে থাক, তাপস কে পাত্তাও দেয় না । তাপসের দুঃখের কারণ জেনে ওকে ওষুধ বাৎলালাম। বললাম যে ভালো নোট দিয়ে যখন কাজ হচ্ছে না, তাহলে এদের ছেড়া ফাটা নোট দিয়ে দেখতে পারো যে কি হয়। বাস যেমন কথা তেমন কাজ। তাপস বোধহয় অপেক্ষা করেছিল স্যালারি পেমেন্ট এর জন্য । ব্যাঙ্ক এ সাধারণত পিয়ন টাকা তুলতে যেত, কিন্তু সে মাসে কি এক বিশেষ কাজ আছে বলে তাপস ব্যাংকে গেলো । কিছুক্ষন বাদে ব্যাঙ্ক থেকে ম্যানেজার এর ফোন, বলছেন যে কি ব্যাপার বলুন তো, তাপস বাবু বলছেন এক বান্ডিল ছেড়া নোট দিতে, তা এত ছেড়া নোট তো নেই । আর ছেড়া নোট যে কেউ যেচে নেয় তাও জানা নেই। আমি ম্যানেজারকে রিকোয়েস্ট করলাম যে তাপস যা বলে দিয়ে দিন, আমি বরং পরে আপনাকে ছেড়া নোটগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেব। সল্টলেকে তখন খুব কম ব্যবসা আর আমাদের একটু হলেও বড়ো একাউন্ট এবং সেই হেতু ব্যাঙ্ক স্টাফদের সঙ্গে আমাদের খুব মধুর সম্পর্ক ছিল।

মাসের সাত তারিখে স্যালারি পেমেন্ট হয়ে গেলো। যদিও তাপস আমায় কিছু বলেনি, আমার বুঝতে বাকি রইলো না যে ও কিছু মেয়ের স্যালারি প্যাকেটে ছেড়া নোট দিয়েছে। আট তারিখে সকালে চা খেয়ে একটু কাজে বসব দেখি জনা পাঁচেক মেয়ে তাপসের খোঁজে হাজির। বুঝতে পারলাম তাপসের ছেড়া নোটের পরবর্তী অধ্যায় । তাপসের টেবিল আমার খুব কাছে ছিল । আমার চোখ খাতায় থাকলেও কান ছিল তাপস ও মেয়েদের কথা বার্তায়। কয়েকজনকে অল্প কথায় সরিয়ে দিলো টাকা চেঞ্জ করে, কিন্তু ওর সেই চামেলী, শ্যামলী ও শুভ্রার জন্য বেশি সময় দিলো। বেশ ভালো আলাপ জমালো এবং চা খাইয়ে তাদের রাগ ভাঙিয়ে বন্ধুত্বের এক মধুর সূত্রপাত গড়ল। আমি একসময় এক কৃত্রিম গাম্ভির্য নিয়ে তাপসকে জিজ্ঞাসা করলাম সমস্যার কথা। তাপস জানালো যে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ছেড়া নোট দিয়েছে যেগুলো এই মেয়েদের স্যালারি খামে ভুলক্রমে চলে গেছে এবং ও ছেড়া নোট বদলিয়ে দিচ্ছে। আমি অভিনয় করে তাপসকে বললাম ব্যাপারটা নিয়ে ব্যাংকের ম্যানেজার এর সাথে কথা বলতে। যাক এর পর তাপস এবং ওই মেয়েদের বেশ বন্ধুত্ব ও হাসিঠাট্টার সম্পর্ক চলছিল। তারপর একদিন বোসদা দিলো কিছুটা ঘেঁটে। দিনটা ছিল সোমবার , অর্থাৎ তাপস রানিগঞ্জ থেকে আসে বলে অফিসে আসতে একটু দেরি হয়। চামেলী এসে গৌতমদাকে তাপসের কথা জিজ্ঞাসা করতে গৌতমদা বললো যে তাপস একটু দেরিতে আসবে । চামেলী চলেই যাচ্ছিলো, হঠাৎ সুশোভনদার ঘর থেকে বোসদা বেরিয়ে এসে একটু দূরে দাড়ানো চামেলীকে বলেছিলো মাসিমা একটু নিচে গিয়ে কাউকে দিয়ে গতকালের প্রোডাকশন শিটটা পাঠিয়ে দেবেন। বাস, বেশ বোঝা গেলো যে চামেলী মাসিমা সম্বোধনে বিরক্ত হয়ে কোন কথা না বলে হন হন করে

নিচে চলে যায় । তাপস অনেক কষ্টে ব্যাপারটা ম্যানেজ করেছিল কিন্তু বেশ কিছুদিন বোসদা ও তাপসের মধ্যে কথা বন্ধ ছিল।

আচ্ছা একটা লোকের দুপুরের ভাত খেতে কতক্ষন লাগতে পারে। পনেরো মিনিট, দশ মিনিট, আট মিনিট। কিন্তু এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে দুপুরের খাওয়ার কথা কেউ শুনেছেন? আমি দেখেছি। একদিন লাঞ্চ খেতে বসব , আমার উল্টো দিকে ডিরেক্টর পার্থবাবু বসলেন। আমি খাবার আনতে যাবো কাউন্টার থেকে তো সুশোভনদা ক্যান্টিনের দরজায় ডেকে বললো একটা বিশেষ কাজে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং একটা রিপোর্ট আমাকে পাঠিয়ে দিতে বললো। বড়জোর দেড় মিনিট কথা বলে টেবিলে ফিরে দেখি পার্থবাবু খেয়ে বেরিয়ে গেছেন। আমি তো অবাক। পরবর্তী সময়ে দেখেছি ভদ্রলোক ভাত , ডাল , তরকারি, মাছ, চাটনি ইত্যাদি একসঙ্গে ঘেটে নিয়ে পাঁচ চামচে লাঞ্চ শেষ, সময় এক থেকে দেড় মিনিট।

কিছু লোক থাকেনা , যারা কারণে অকারণে ঘ্যান ঘ্যান করেই যায়, কোনো সময়ে হাসিমুখে দেখা যায় না। আমাদের মেইনটেনেন্স কন্ট্রাক্টর মদনবাবু ছিল এইরকম এক ব্যক্তি। মাসের কুড়ি তারিখ থেকে তাগাদা দিতে থাকতো, যদিও পেমেন্ট মাস শেষ হলেই হবে তা তিনি ভালো করেই জানতেন। তা এহেন মদনবাবুর কোম্পানির পেমেন্ট চেক তাপস আমার কাছে নিয়ে এলো। চেকে কোনো ডেট নেই। তাপস কে একথা বলতে, তাপস আমায় কিছু কথা বললো এ ব্যাপারে যা একটু পরে বলছি। যাক সে মাসে বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি তাপস মদনবাবুকে চেক দিয়ে দিলো। এর দিন পাঁচেক পর মদনবাবুকে অফিসে দেখা গেলো। তাপস মদনবাবুকে কুশল জিজ্ঞাসা করে একটানে জিজ্ঞাসা করলো যে চেকের টাকা পেয়েছে কি না। মদনবাবু জানালেন যে ব্যাঙ্ক চেক রিটার্ন করেছে আর ওনাকে বলেছে দশ বছর বাদে চেক জমা দিতে। আগ্রহবশতঃ চেকটা দেখতে চাইলাম। দেখি দিন মাস এক রেখে তাপস বছরটাকে ১৯৮৫ এর জায়গায় ১৯৯৫ করে দিয়েছে আর ব্যাংকের স্টাফ মদনবাবুকে রসিকতা করে দশ বছর বাদে চেক প্রেসেন্ট করতে বলেছে। যাক এবার তাপস ওই চেকের বদলে একটা কারেন্ট তারিখের চেক সই করিয়ে দিয়ে দিলো যাতে প্রব্লেম আর বেশি দূর না গড়ায়।

আগেও বলেছি, আবারও বলছি যে সে সময় সেক্টর ফাইভ একটা দুর্গম জায়গা ছিল। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সেলস ট্যাক্স, পিএফ, ইত্যাদির ইন্সপেক্টররা আসতোই না, ইন্সপেকশন তো দূরের কথা। তবে একবার পুজোর কিছুদিন আগে এক ই এস আই ইন্সপেক্টর এসে হাজির। বেশ বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক পুজোর আগে কিছু উপরির আশায় এসেছে । তাপস এসে জানালো যে ওর রেকর্ড কিপিং এ অনেক ব্যাকলগ। আমি ওকে বললাম যেভাবে হোক ম্যানেজ করতে। তা তাপস ভদ্রলোককে চা বিস্কুট খাইয়ে গল্প শুরু করলো আমাদের পিয়ন বাহাদুরকে আগেই শিখিয়ে রেখেছিলো জানলাগুলো একটু বাদে খুলে দিতে। ১৯৮৫ সালে সেক্টর ফাইভের বিকেল, কিছুক্ষনের মধ্যে ঘর ভর্তি মশা, পোকা মিলে একসার। ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক পালাতে পারলে বাঁচে। তাপস তাকে তাড়াতাড়ি মিষ্টি খাওয়ার কিছু টাকা দিয়ে , কোম্পানির গাড়ি করে করুণাময়ী অবধি পোঁছোবার ব্যবস্থা করে দেয়। ভদ্রলোক বলে যান আবার আসবেন, কিন্তু আর কোনদিন তার দেখা পাওয়া যায়নি।

এরকম আরও নানা মজার ঘটনা চাকরিজীবনে ঘটেছে। আজ এখানেই রাখছি, পরে না হয় আরও কিছু ঘটনা জানাবো । ■

লঙ্কা কাণ্ড

- গৌতম সরকার

ইউরোপ, অ্যামেরিকা, বা অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ঘোরার পর রাজস্থানের পুস্করে এসে মনে হোলো যে এর মতো জায়গা পাওয়া দুষ্কর! ‘রাজস্থান’ নামটা শুনলে (মায় ‘ভারতবর্ষ’ নামটাও!), আমি আমার মানসচক্ষে যা দেখতে পাই তা হোল একটা ‘রত্ন-ভাণ্ডার’ বা প্রকারান্তরে একটা ‘জুয়েলারি-বক্স’; তবে বেশ নোংরা, এই যা! তা জুয়েলারি-বক্সেও ধুলো পড়ে বৈ কি!

রাজস্থানের আনাচ-কানাচ বা সর্বত্রই যেন মনি-মুক্ত খচিত। এই প্রাসাদ, তো সেই কেল্লা; এই মন্দির, তো সেই সমাধি; এই হ্রদ, তো সেই দীঘি – সর্বত্র ছড়ানো। আর আছে হরেক রকম সংস্কৃতি, যা বদলে যায় থেকে থেকেই, কয়েক কিলোমিটার অন্তর অন্তর। আর এইসবের কিছুই যদি পছন্দ না হয়, তাহলে শুধু যেতে হবে পুব থেকে পশ্চিমে, আর দেখা যাবে সবুজের সমারহ কেমন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে রুক্ষ মরুভূমিতে। এ হেন রাজস্থানেই আবার পাওয়া যায় আর একটা জিনিস - ‘লংকার-তরকারি’।

লংকা তো আমরা ভারতীয়-উপমহাদেশের লোকেরা কম-বেশী সকলেই খাই; এই ফোড়নে বা সেই তরকারিতে, এই ঝোলে না হয় সেই ঝালে। কিন্তু তাই বলে তরকারির পুরোটাই শুধুই লংকা? তেমনটা আগে কখনো শুনিনি। তবে তা খাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো আমার এক বন্ধুর সাথে। সত্যি কথা বলতে কি বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বটাই হয়েছে এই লংকার-তরকারিকে কেন্দ্র করে!

বিকানির থেকে ফিরছিলাম ট্রেনে। উদ্দেশ্য দিল্লী, আর সেখান থেকে উত্তর ভারত। ট্রেনে রাত্তির হবার বেশ আগেই ক্যাটারারদের একজন রাতের খাবারের অর্ডার নিতে এল। আমি যথারীতি এড়িয়ে গেলাম, খাবারের ‘হাইজিন’কে প্রশ্ন করে। আমার উল্টোদিকে বসা একজন জিগ্যেস করলেন যে কি ব্যাপার, খাব কি? ওর সাথে পরিচয় হোল, জানালাম যে ও বিকানিরের ছেলে, দিল্লী আই.আই.টি তে পড়ে, ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে ফেরত যাচ্ছে। জানালাম যে আমার কি হাল! বেশ কয়েকবার নিজের দেশে এসে নিজের পছন্দের খাবার খেয়েই উল্টেছি, তাই মনে ভয়! একা একা ঘুরি, কোথাও উল্টে গেলে? তাই এদিক-ওদিক খাওয়া বাদ।

ও প্রস্তাব দিল যে আমি নির্ভয়ে ওর সাথে আনা খাবার খেতে পারি। খাবার স্বয়ং ওর নিজের মায়ের হাতের তৈরি, ওদের বিকানিরের বাড়িতে; তবে খাবারে যে মাছি বসেনি তার একশো ভাগ নিশ্চয়তা ও দিতে পারবে না! সাহস করে রাজী হয়ে গেলাম। বদলে ওর আবদার এই যে ওকে আমার পাসপোর্টটা একবার দেখতে দিতে হবে, ও একটু দেখতে চায় যে বিভিন্ন দেশের ভিসা-স্ট্যাম্পগুলো কেমন দেখতে হয়!

ও যে নিরামিষাশী তা আগেই জানিয়েছিল, তবে পোঁটলা থেকে যে খাবার ও বার করলো তার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। রুটিটা দেখে ঠিকঠাকই মনে হোল, তবে তা খেতে হবে যা দিয়ে তা দেখেই অবাক হয়ে গেলাম – এক খাবলা কাঁচা লংকা, তবে তা রীতিমত রান্না করা! রান্নার সময় তাতে বোধহয় শুধুমাত্র দেওয়া হয়েছে নুন আর জিরের গুড়ো!

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম যে এ কি বিড়ম্বনা, এতে মাছি না বসে থাকলেও এত লংকা খেলে তো নির্ঘাত উল্টে যাব; আজ রাত্তিরে না হোক, কাল সকালে তো বটেই! দেখলাম যে ও দিব্যি চেটে-পুটে খাচ্ছে। জিগ্যেস করলাম যে ওর ঝাল লাগে না? ও বলল যে খেয়েই দেখ না। সাহস করে একটু মুখে দিতেই আমার গলা-বুক একেবারে জ্বলে গেলো। আর খেতে পারলাম না।

আমাদের বন্ধুত্ব আজও অটুট, ফেসবুকে কথা হয় মাঝে-সাঝেই। ওর থেকে আমি শিখি হিন্দি, আর ও আমার থেকে ইংরিজি। পরে একবার দিল্লী গিয়ে ওর সাথে দেখাও করে এসেছি, সাথে দিল্লী আই.আই.টির ক্যাম্পাসও। আজ ওর সাথে ফেসবুকে কথা হবার পরেই ভাবলাম যে ঐ লংকার তরকারি বানালে কেমন হয়? একটু রয়ে-সয়ে লংকার বদলে ব্যাবহার করলাম ক্যাপ্সিকাম (বেল-পেপার), আর নুন-জিরের সাথে অন্য কিছু মশলাও। মন্দ হয়নি। ■

দেবীপক্ষের সূচনা

- আগমনী পাঠক

এবারে ফাল্গুনে একটিই মাত্র বিবাহের লগ্ন, তবে ফাল্গুনের প্রতি গোধূলিই চার হাত এক করার উত্তম সময়। আজ তেমনি এক গোধূলি, দেবাঙ্গি আর অংশু'র শুভদৃষ্টি, মালাবদল সম্পন্ন হবে। তবে ঠাকুরমশাই বার বার বলে দিয়েছেন সন্ধ্যা ৫ টা ১০ এর গোধূলি লগ্ন অবশ্যই ধরতে, সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠিগুলির মধ্যে সঠিক সময় নাকি অন্যতম। তাই ভোর থেকেই দেবাঙ্গির বাড়িতে ভীষণ তৎপরতা। দেবাঙ্গি এই বছরই ইতিহাসে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে। দেবাঙ্গি আর অংশুর প্রেমের বিয়ে। স্বভাবতই দেবাঙ্গি ভীষণ খুশি। আগের দিন রাত থেকে ওর সকল ভাইবোন, ওর বন্ধুরা মিলে খুব মজা, খুব হইচই করেছে। দেবাঙ্গি আজ মনের মত করে সাজবে, ওকে সাজাতে ওর মধ্যবিত্ত বাবা কোনও কার্পণ্য করেনি। ওর দু হাত ভর্তি মেহেন্দি, মেহেন্দির মধ্যে লেখা হয়েছে অংশুর নাম, আর ওর মনে বাসা বেঁধেছে এক সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন। সেই গৃহকোণে বুনেছে এক স্বপ্নের রাজ্য, যে রাজ্যে শুধুই ভালবাসা আর ভালবাসা, না বর সোহাগের কথা বলছি না, সে তো আছেই, তার পাশাপাশি মা এর ভালবাসা, বাবার স্নেহ, বোনের খুনসুটি সব আছে। অংশুর বাড়িতে ওর মা বাবা আর একটি বোন আছে। বোন মিলি প্রায় দেবাঙ্গির বয়সী। দেবাঙ্গি মা বাবার একমাত্র মেয়ে , ওর কোনও ভাই বোন নেই। দেবাঙ্গির ঝুলিতে বাবা মার ভালবাসার কোনও কমতি ছিল না, মা মানেই স্নেহময়ী, আর বাবা মানেই নিশ্চুপ এক ভালবাসার খনি। এই ছিল দেবাঙ্গির ধারনা! অংশুর বাবা মাকেও ঠিক এমনি করে ভালবাসার সম্পর্কে বাঁধার সদিচ্ছা ওর মনে আগলে রেখেছে। ভাই বোন নেই বলে যে একটু দুঃখ আছে সেইটা পূরণ করবে ও ওর নতুন সংসারে। দেবাঙ্গির মনে এখন এরমই সাতরঙা স্বপ্নরা জাল বুনেছে।

অংশুও বানিজ্য বিভাগে কোনোরকমে গ্রাজুয়েশনটা শেষ করেই বাবার ব্যবসা দেখাশোনার কাজে মন দিয়েছিল। ওর দায়িত্বে ব্যবসার বেশ বাড়বাড়ন্ত হচ্ছিল। দেবাঙ্গির বা অংশু কারুর বাড়িতেই বড়ো বেশি আপত্তি কেউ করেনি। ওদের প্রেমের রথ চারটি বসন্ত অতিক্রম করার পর, পঞ্চম বসন্তে ওরা এক হয়ে সংসারী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সকালে দিনের প্রথম সূর্য কিরণের মতো স্নিগ্ধ কমলা রঙের শাড়ী পরে গায়েহলুদ, তারপর গোধূলিতে লাল বেনারসিতে রানীর সাজে বিবাহ মণ্ডপের পাশে আরও কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা।

ওদিকে যথা সময়ে রাজার বেশে টোপর মাথায় দিয়ে ফুল সাজানো গাড়িতে অংশুও হাজির হল।

এরপর আর কি! "যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম"। বৈদিক মন্ত্র তো নিতান্তই সামাজিক নিয়ম পালনের জন্য, ওই মন্ত্রের বহুদিন আগেই ঋষি প্রজাপতির ইচ্ছায় ওদের একে অপরের হৃদয় বিনিময় হয়ে গিয়েছিল।

সব রূপকথার গল্প এখানেই শেষ, "তারপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করল" মোটামুটি এই রকমই হয় রূপকথা (বা প্রেমের) গল্প। তাই আজকের গল্প ওই শেষের পরের অংশ নিয়ে।

লাল টুকটুকে শাড়ী পরে আলতারাঙা পায়ের ছাপ ফেলে দেবাঙ্গি তার নতুন সংসারে প্রবেশ করল। বধূ বরনের সময়ই সকলের উৎসুক দৃষ্টি যে দেবাঙ্গির দিকে, তবে তা দেবাঙ্গির সৌন্দর্যের জন্য নাকি তার অলঙ্কার পরখের জন্য তা তারাই জানেন!

স্ত্রী আচার পালনের সময়ই ওর খুড়ততো ননদ বলল , "হাত টা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, বলি কিছু সোনার জলে গিলটি করা চুড়ি বা একটা মানতাসাও তো পরতে পারতে"। ও কথার বিশেষ অর্থ যদিও দেবাঙ্গি বুঝল না, ও সরল ভাবেই বলল, "কেন দিদি , হাতে তো চুর , শাঁখা বাধানো আর পলা বাধানো আছে, খালি নেই তো"।

দেবাঙ্গির উত্তরে ননদ যদিও মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, "উম্ম, কই , হাত এখনও খালি, আর ভাই কি আমার ফেলনা ওর হারটাও বড়ো সরু"। আর একটু মুখ আড়াল করে বলেছিল, "মেয়ের মুখ খুব গো, মুখে মুখে এখন থাকতেই খুব কথা ফুটেছে দেখছি"।

এই অবধি শুনে হয়ত ভাবছেন এবার শ্বাশুড়ী বৌমার সেই চিরাচরিত গপ্পো। আপনারা খুব খারাপ যে কিছু ভেবেছেন তা নয় তবে এই চিরাচরিত গপ্পো গুলো কোনও দেবাঙ্গির জীবনেই পুরানো হয়না। তাই এই দেবাঙ্গির কিছু কথা নাহয় আর একবার শুনলেন।

বিয়ের পরের ঐদিনের ব্যবহার সংসার অনভিজ্ঞ দেবাঙ্গি বুঝতে না পারলেও আজ বোঝে দেবাঙ্গি। ওটা ওকে তাচ্ছিল্য করার প্রচেষ্টা হলেও ওটা আসলেই সমাজের বিষ যা প্রতিটা মেয়ের মধ্যে আছে আর সেই বিষের জ্বালায় যুগ যুগ ধরে জ্বলছে। তবে শিক্ষার আলো ধরে আধুনিক সমাজে সেই বিষের যন্ত্রণা আগের তুলনায় একটু ম্রিয়মান হয়েছে বইকি। তবে যন্ত্রণা যে সয় তার কাছে কি সেটা ম্রিয়মান হয়? তার কাছে সেটাই তখন চরম সত্য!

দেবাঙ্গির প্রেমের বিবাহ তাই ওর স্বামীর ভালবাসার প্রতি বড়ো বেশি অভিযোগ ছিল না, কিন্তু সংসারের জটিল পাকে পড়ে ভালবাসার সাতপাক মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর আলগাও হত।

ওর ননদকে বেশ আধুনিকা করেই মানুষ করেছে ঠিক দেবাঙ্গিকে যেমন ওর বাবা মা করেছে । বিয়ের সপ্তাহ দুয়েক পর দেবী মানে দেবাঙ্গি যখন শাড়ী ছেড়ে একটু ঢিলেঢালা সালোয়ার কামিজ পরতে গিয়েছিল, ওর শ্বাশুড়ী মা ওকে নিষেধ করে হাতে লাল পাড় সুতির কাপড়টা দিয়ে গিয়েছিল। সুতির কাপড়টিকে যদিও ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে মাড় নষ্ট করে নরম করেই হাতে তুলে দিয়েছিল দেবাঙ্গির শ্বাশুড়ী মা, কিন্তু সে শাড়ী পরে দেবী যখন বেরিয়ে দেখেছিল ওর থেকে মাত্র দু বছরের ছোট মিলিকে ওই একই মহিলা শাড়ী না পড়িয়ে জিন্স আর টপ পরিয়ে কলেজের অনুষ্ঠানে পাঠালেন, তখন দেবী মন থেকে নিজের মাকে খুব মিস করেছিল। ওই মনখারাপের ভিড়ে একটুখানী যে ভালবাসা ছিল সেটা আর দেখা হল না দেবীর। বাড়ির মেয়ে যা করতে পারে বাড়ির বউ সেগুলো করতে পারে না, সেগুলো করতে গেলেই লাগে অনেকের পারমিশন! ব্যাপারটা সেই বনের পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে রেখে বাড়ির শোভা বাড়ানো হল তারপর আবার তাকে খুব যত্ন করে খাইয়ে বদ্ধ ঘরের মধ্যে উড়তে দিয়ে পশুপ্রেমী সাজার মতই পুলক দায়ক।

যাইহোক এই ভাবেই এগোচ্ছিল দেবাঙ্গির দিন। দেবী সবকিছুকে এরমই হয় ভেবে মেনে নেওয়ার বা বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরকম চেষ্টা আমি আপনারা এমনকি দেবাঙ্গির মা বা শ্বাশুড়ী মা সবাই চালিয়েছে নিজের জীবনে আর ভেবেছে, এ কষ্ট সে তার আপন মেয়েকে পেতে দেবে না, কিন্তু সেই ভাবনার ভিড়ে একবারও ভাবা হয়নি যে এ কষ্ট আপন বউমাকে আর পেতে দেব না।

দেবাঙ্গির মনটা কদিন ধরেই একটু খারাপ যদিও মাস খানেক আগে দেবী একবার গিয়েছিল ওর মায়ের কাছে তবুও মায়ের শরীরটা ঠিক ভাল নেই শুনে মন বড়ো উতলা হয়েছে। বাড়িতে ওর আজন্ম পরিচিত জন্মভিটে তে যাওয়ার পারমিশন চাইল কিন্তু সেটি না মঞ্জুর হল। দেবী অংশুর কাছে আর্জি জানাল, কিন্তু সামনেই পুজো তাই সেই পুজোর জামা কাপড় নিয়ে একবারে কয়েকদিন পরই যেতে বলল অংশু। আজ দেবাঙ্গির নিজেকে বড়ো অসহায় লাগলো, জন্মদাত্রী মাকেও দেখতে যেতে পারছে না! অথচ ও অংশুকে সব সময় খুব উতলা হতে দেখে যখনই ওর শ্বাশুড়ী মার কিছু সমস্যা হয়, কিন্তু দেবীর কষ্টটা, ওর উদ্বিগ্নতাটা কেউই বুঝল না। এসবের মাঝে পড়ে দেবী মাঝে মাঝেই নিজের ধৈর্য হারায়, তখনই এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে দেবীর গায়ে 'মুখরা বউ' এর তকমাটা লেগে যায়।

দেখতে দেখতে মহালয়া এসে গেল, আজ দেবী খুব খুশি, আজ ও ওর মাকে দেখতে যেতে পারবে যে! সবাই ভোরে উঠে পড়েছে, মহালয়াও শোনা হয়ে গেছে, শ্বাশুড়ী মার সাথে হাতে হাত লাগিয়ে দেবী মোটামুটি সংসারের সব কাজ শেষ করে আলমারি থেকে ঢাকাই শাড়ীটা বের করে রেখে স্নানে গেল। স্নান সেরে এসে শাড়ীটা পরতে পরতে অংশু ঘরে ঢুকল , ঢুকে অংশু বলল, "আজ খুব ইম্পরট্যান্ট একটা কাজ এসে গেছে আজই আমাদের ডেলিভারি দিতে হবে, লক্ষ্মীটি আজ যেতে পারব না, একেবারে সপ্তমীর দিন যাবো কেমন"। এই বলে দেবীর একটু কাছে এসে দেবীর কপালে একটা স্নেহ চুম্বন এঁকেদিয়ে দেবীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘর থেকেই বেরিয়ে গেল।

দেবী চুপ করে, বিছানার উপরে থপ করে বসে পড়ল। মোবাইলটা হাতে নিল মা কে ফোন করে জানাবে যে, আজ যাবে না ওরা। হাতে নিতেই একটু আগে আসা হোয়াটস্যাপ মেসেজের উপর চোখ গেল, তাতে লেখা আছে, "আজ দেবীপক্ষের সূচনা, সাথে সূচনা হোক নারীশক্তির ও"। ওই শব্দ গুলো যেন দেবীর মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন আনল। দেবী আবারও ওর ঢাকাইটা ভাল ভাবে পরে নিল, সব কেনা নতুন জামা কাপড় গুলোও ব্যাগের মধ্যে নিল আর অংশুকে একবার ডেকে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

"বিয়ের আগে তোমার সাথে দেখা করতে আমি একাই যেতাম , একাই গঙ্গা পেরিয়ে প্রিন্সেপ ঘাটেও পোঁছেছিলাম। আজ তোমাদের বাড়ির বউ হলেও বিশ্বাস করো আমার জন্মভিটের রাস্তা আমি ভুলে যাইনি। তাই একাই আমি যেতে পারব। চাইলে তুমি আমাকে বাস স্টপ পর্যন্ত পোঁছে দিয়ে আসতে পারো। আর জানতো মা দুর্গা একাই আসেন মহাদেবকে সঙ্গে নেননা কিন্তু!" এই বলে ব্যাগ নিয়ে দেবী বেরিয়ে এসে ওর শ্বাশুড়ী মা কে প্রনাম করে বলল, "মা কদিন আমি একটু আমার মায়ের কাছে থেকে আসি"।

দেবী বেশ খানিকটা হেঁটে এগিয়ে গেছে তখন দেবীর সামনে অংশু বাইক নিয়ে এসে দাঁড়াল, বলল "উঠে এসো, আজ তোমার মহাদেব নয় বাহন হিসাবেই তোমার আর এক বাড়িতে দিয়ে আসি চলো"

দেবীও চোখের কোনের হালকা জলের রেখাকে আর বইতে না দিয়ে প্রসন্ন চিত্তে অংশুর বাহনের চড়ে বসল।

"মা দুর্গা কিন্তু আবার মহাদেবের কাছে ফিরে আসে, দেখো তুমিও ফিরে এসো কিন্তু"

"ধ্যাত, শুধু ইয়ারকি না! তা আমার এই বাহনটি গেলেই আবার তাতে চড়ে ফিরে আসব"

এই কথা বলেই ওরা দুজন হাঁসতে লাগল, আর অংশুর বাইক হওয়া চিরে এগিয়ে গেল।

এইভাবে মনের মাঝে কষ্ট জমিয়ে রাখলে সেই কষ্ট গুলো ক্রোধাগ্নি রূপে যদি বেরিয়ে সামনের সম্পর্কগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়, তার থেকে ভাল, সেগুলোকে বাড়তে না দেওয়া, নিজের অধিকার অন্যের হাতে তুলে দিয়ে নয় অন্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকার মাধ্যমেই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হোক। দেবীপক্ষের সূচনাতে বৃহৎ কিছুনা, এইরকম নিজের ছোট ছোট ইচ্ছে গুলো পূরণের অধিকার সব দেবীরাই যেন নিজের কাছে রাখতে পারে!

দেবীপক্ষে নয় শুধু, সব পক্ষে দেবীরা ভাল থাকুক আর ভাল রাখুক সকলকে, কেননা ভাল রাখার দায়িত্বতো দেবীদেরই দিয়েছেন পরম প্রেমময় ঈশ্বর । ■

ঈশ্বর, তোমার কুঞ্জবনে

- হেমন্ত কুমার সরকার

ঈশ্বর, তোমার কুঞ্জবনে
সবাই রাজা, সবাই প্রজা ।
ঈশ্বর, তোমার কুঞ্জবনে
পাখী আছে গান আছে
আলো আছে বাতাস আছে
লতা আছে ফুল আছে
নদী আছে আকাশ আছে
বসন্ত আছে শরৎ আছে
গ্রীষ্ম আছে শীতও আছে
তবু ঈশ্বর, তোমার কুঞ্জবনে
প্রশ্ন কেন করতে হয় ?
ভালবাসা কেন খুঁজতে হয় ?
ভুখা কেন মরতে হয় ?
সাদা কালোয় ভেদ কেন ?
ঈশ্বর, তোমার কুঞ্জবনে
খুঁজলে কী -
শান্তি পাওয়া যায় নাকি ?

বিনিময়

- দুহিতা সেনগুপ্ত

সামান্য কিছু লিখে মুছে ফেললেও অনেক খানি লিখতে চাওয়া উধাও হয়ে যায়।
ভাবনা আসে আর কি হবে,
কে কখন কোথায় কবে
দেখবে এসব?
কার সময়ে সময় আছে?
হাত বলবে,- 'আমার কাছে
কলম ছিল'
চোখ বলবে,- 'আসেনি ঘুম,
নিদ্রাহীনে মন ভোলাবার
সুযোগ নিল।'
মন বলবে - 'আমি তো রোজ
ভুলে যাওয়ার নেশায় ভরা,
যদি আজ কিছুক্ষণ এর মনে পড়া -
'মুঠোয় আছে'-র আশ্বাসে ফের দূরের করা -
ফিরে আসতে চায়-।' ..
যদি তার ইচ্ছে করে,
ভাবনা গুলোয় শব্দ ঝরে,
না বলারা জলের দরে,
চোখের হয়ে যায়।
এমনি কোনো দুপুর শেষে,
অন্য কোনো ছদ্মবেশে,
হয়তো ভুল করেই এসে,
চোখ পড়ল কারো।
বুঝলো সে এক গোপন রাগ -এ
বাদীর অভাব ভীষণ ভাবে,
বুঝলো সে ওই আলগা তার -এ
টান -এর বড় টান।
বুঝেও সে ওই পাতার ভাঁজে,
হাজার ধুলোর সুক্ষ কাজে,
হাত রেখে এক আলতো খাঁজে,
ঢাকলো অভিমান।
মন জানলো, এটাই পাওয়ার,
উর্দ্ধে যাওয়া অনেক চাওয়ার,
অন্য মনের, অন্য হাওয়ার,
খানিক পাওয়া স্বাদ। ..
তাই তো আঙ্গুল কলম রাখে,
তাই জানিনা কিসের ডাকে ,
লিখতে গেলেই কেবল ঢাকে
আমার অবসাদ....

শরৎ ও ব্রাত্যজন

- সুব্রত বনিক

শরৎ হাসে নীল আকাশে
যেন হীরে-চুনী-পান্না।
মা দুগ্গা আসেন জড়োয়া সাজে,
আড়ালে থাকে যে কান্না।
আগমনীর গানে ধরার বুকে
শিউলি ছড়ায় ঘ্রাণ,
কাশের বুকে লাগে যে দোলা,
আনন্দে যে মাতে প্রাণ।
পুত্র-কন্যা সহ আসেন মা
খুশী ঝরায় রবি-শশী,
শুধু দুখে ভরে ওঠে ওদের মন,
যায় মিলায়ে মুখের হাসি।
যতদিন ছিল শধুই বাধা বাঁশ
দোল খেয়ে যেত ওরা,
যেদিন মা এলেন ধরায়,
শুধুই ওরা পালিয়ে বেড়ায়,
আর পাইনে তাদের সাড়া।
চারিদিকে আলো ঝলমল
শুধুই খুশীর দিন,
শুধু ওদের মুখ আজ রয়েছে যে মলিন
করেছে দুখের কাছে ঋণ।
কেউতো দেয় না বাড়ায়ে হাত দুটি
যাদের আছে তো অনেক,
মা কে নিয়ে মাতোয়ারা সকলে,
চাহে নাতো ফিরে বারেক।
মা কেমনে থাকেন খুশী
জড়োয়ারই সাজে,
যখন অভুক্ত শরীর লুকায় মুখ
মলিন বসন লাজে।
ধনীর ঘরে শরৎ হাসে
গরিব কেঁদে মরে,
মা কেন আসেন বছর বছর
যখন ওদের অশ্রু ঝরে।

পৃথিবীর প্রতিশোধ

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা মেনে নিতে পারে নি সে।
তাই নিজের জন্য বানিয়ে নিয়েছিলো
অন্য এক বাসযোগ্য পৃথিবী।
প্রতিদ্বন্দিতার স্পর্ধা
সহ্য করলো না পুরোনো পৃথিবী।
তার জায়গা নির্দিষ্ট হলো
দশফুট বাই দশফুট
শ্যাওলাভরা স্যাঁতস্যাঁতে এক ঘরে।
উঁচু পাঁচিল-অলা যে বাড়িতে ঘরটা
তার বাইরে বড় বড় করে সাইনবোর্ডে লেখা
পাগলা গারদ।

আত্মকথা

- বিশ্বনাথ পাল

গলায় রয়েছে জোর হাতে বা একটু কম
বুদ্ধি নয় প্রখর তবু বুকেতে আছে দম

চলতে চাইছি সোজা লক্ষ্যতে চোখ রেখে
হাজারো কাজের বোঝা দৃষ্টি যাচ্ছে ঢেকে

লক্ষ্য হারিয়ে যায় এটা ? নাকি ওটা ?
জীবনযুদ্ধে হায় লক্ষ্যবিহীন ছোটা

বাঁকা পথের কথা অনেকেই তো বলে
খাটাতে হবে মাথা কিভাবে কৌশলে

তবু চেষ্টা অবিরত মনকে রাখতে সাদা
মধ্যবয়সটা তো বরই গোলোক ধাঁধা

প্রকৃতি ও প্রলয়

- সুপ্রীতি গুড়িয়া (ভূঁইয়া)

হে প্রকৃতি,
তুমি তো ইশ্বর, তুমি তো নারী,
তোমার অসীম ক্ষমতার দানে
এ ধরিত্রী হয়ে উঠেছে শস্যশ্যামলা,
এ বসুন্ধরাকে এতো মোহময় করে
বাসযোগ্য করেছ সেই তুমি,
তোমার ঐ মায়াবিনী কোলে
বিশুদ্ধ প্রাণবায়ুর আঘ্রাণেই
এ ধরা পেয়েছে বেঁচে থাকার রসদ,

তবুও......

আশ মেটেনি এ ধরার প্রাণীকুলের,
বারবার আঘাত করেছে তোমায়,
দীর্ণবিদীর্ণ করেছে তোমার হৃদয়,
ছিন্ন ভিন্ন করেছে তোমায় কুঠারাঘাতে
তুমি নির্বিকার থেকেছো, ক্ষমা করেছো,
তোমার অবোধ সন্তানদের...
তাই তারা হয়েছে বেপরোয়া
থামতে শেখেনি তারা
তারা শুধু পেতেই চেয়েছে তোমার কাছে,
দুহাত ভরে শুধুই নিয়েছে
অকাতরে দেওয়া তোমার দান...
কিছুই শেখেনি ফিরিয়ে দিতে,
তুমি যে মা, জননী, নারী-
সহ্য তো তোমায় করতেই হবে!
তুমি সর্বংসহা।।

কিন্তু,

জানি, আজ তোমার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত,
আজ তুমি সর্বংসহা নারী নয়,
আজ তুমি শিক্ষয়িত্রী,
তোমার নির্বোধ সন্তানরা তাই আজ দেখছে
তোমার প্রলয়ঙ্করী রূপ।
আজ তুমি অবতীর্ণ হয়েছ
মানুষরূপী অসুর বিনাশী মাতৃ রূপে –
ক্ষমাদাত্রী রূপে নয়।।